প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

মুদ্রাকর :
বিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট : রবীন দত্ত

সন্তোষকুমার ঘোষ
এবং
গৌরকিশোর ঘোষকে

এই রচনা-সংকলন অনেকটা টুইস্ট নাচের মতই পাঁচমিশেলি। গোড়ায় রয়েছে মারকিন-প্রবাসের কয়েকটি ছবি; তারপর বিলিতি বিনোদিনী ক্রিশচিন কীলারের প্রণয়-উপাখ্যান, বছর কয় আগে ভারত সফরে আসা পাকিস্তানী ক্রিকেট-দলের কেলেংকারীর কাহিনী এবং সবশেষে কলকাতার সিনেমাপাড়া ও শান্তিনিকেতনের কিছু স্মৃতি। অন্য কিছুতেই নয়, একটির সঙ্গে অন্যটির একমাত্র মিল বিষয়বস্তুর লঘুতায়।

বেশীর ভাগ লেখাই বেরিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকায়। বাকি ঘরণী, জলসা এবং উল্টোরথে। পত্রিকাগুলোর কর্তৃপক্ষদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই খ্যাতিমান সাহিত্যিক মনোজ বসু ও সহকর্মী অমরেন্দ্রনাথ সেনকে। প্রথম জনের তাগাদা এবং দ্বিতীয় জনের সাহায্য ছাড়া এ বই কিছুতেই বেরোত না।

—অ. চৌ.

ট্যুইস্ট

অনেকে বলেন, দ্বিতীয় দশকের সেই জাজের যুগ আবার ফিরে এসেছে।

কথাটা মিথ্যে নয়, ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় থেকে দেখে এসেছি, গোটা মারকিন মুলুক আবার রাতভর নাচতে শুরু করেছে। তবে জাজের চেয়ে ঝাঁঝ বেশি। কী বাজনা, কী দেহভঙ্গী—সব কিছুই আরও উদ্দাম। শুধু দেহ নয়, মনটাকেও দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলার জন্য পণবদ্ধ। এযুগের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী তার পায়ে সর্বস্ব সমর্পণে বেরিয়ে পড়েছে এবং গাছের তলায়, ঘরের আঙিনায়, পথে-ঘাটে, ক্লাবে, পার্টিতে সর্বত্র চলছে তাদের দেহের "আন্দোলন"।

এই "আন্দোলনের" নাম ট্যুইস্ট। কলকাতায় থাকতে হোটেলে পার্টিতে এই ট্যুইস্ট নাচের সঙ্গে পরোক্ষ পরিচয় কিঞ্চিৎ ছিল, কিন্তু সে নিতান্তই মোলায়েম ব্যাপার। আমেরিকায় অন্য জিনিস। এবং এই 'ট্যুইস্টেড-এজে'র একটি গণ-নৃত্যের বা "গণ-আন্দোলনের" সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় সেখানে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই।

ওয়াশিংটন থেকে এসেছি ব্লুমিংটন। সেখানকার ইনডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে। নেমেই সবার মুখে শুনি 'ওয়াটারমেলন ফেসটিভেল' অর্থাৎ বার্ষিক 'তরমুজ-উৎসবে'র কথা। প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহেই নাকি হয়। প্রফেসর ইয়োকাম আর প্রফেসর আরপান দুজনেই অনবরত বলতে থাকেন, "ডোন্ট মিস

দিস আমিট্, দারুণ ব্যাপার।" ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক প্রত্যেকের মুখেও এ ছাড়া অন্য কথা নেই। আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বর্ষামঙ্গল-বসন্তোৎসবের আবহাওয়ায় মানুষ, এখানকার এই বিশ্ববিদ্যালয়-শহরের তরমুজ-উৎসবের একটা মনোরম দৃশ্য কল্পনায় গেঁথে রাখি।

রাত আটটা বাজতে না বাজতেই যথাস্থানে গিয়ে হাজির। কিন্তু কোথায় সেই বসন্তোৎসবী আবহাওয়া? ইউনিভারসিটি ক্যামপাসের ভিতরেই বিরাট গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। সেখানে আলোয় আলোয় চোখ-ধাঁধানি ব্যাপার এবং চিৎকার-চেঁচামেচিতে কানের অন্তঃপুরে ধুন্ধুমার কাণ্ড।

ভয় পেয়ে গেলুম। ব্লুমিংটন তো আধুনিক শহর, কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের চোটে তো মনে হচ্ছে রুয়ান্ডা উরুনড়ির কিংবা মককৃচণ্ডের কোন গভীর অরণ্যে এসে পৌঁছেছি। 'হুই-হাই' চিৎকার আর তিড়িং বিড়িং ফড়িং-নাচের উপযোগী যন্ত্রণা-সংগীত। চোখ বুজতেই মনে হল, অগ্নিকুণ্ডের চারধার ঘিরে বাইসনের চামড়ায় তৈরি ঢাকের আওয়াজ চলছে। চলছে বল্লমধারী অর্ধ-উলঙ্গ আদিবাসীর আদিম উল্লাস।

চোখ মেলতেই দেখি, গোটা জায়গা জুড়ে হাজারখানেক ছেলে-মেয়ে বিস্রস্ত বসনে, উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে উন্মাদের মত লাফিয়ে চলেছে। চুলের ঠিক নেই, পোষাকের ঠিক নেই, পায়ের দাপাদাপিতে টেনিস লনের ভিত ফাটে ফাটে।

বাজনার লয় যত বাড়ে দাপাদাপি ওঠে চরমে। উপরন্তু দাঁত-মুখের খিঁচুনি দেখে মনে হল, হয় সবাইকে মৃগীরোগে ধরেছে কিংবা ভূতে পেয়েছে,—এখনই ওঝা ডেকে আনা দরকার।

প্রত্যেকের চোখে কীসের যেন ঘোর। সবাই অতি দ্রুত দুলছে, হেলছে, টলছে। এবং সংক্ষিপ্ততম পোশাকে বেআব্রু মেয়েদের সামনাসামনি ঘুরপাক খেয়ে চলেছে রঙের দোকানের

বিজ্ঞাপনের মত রামধনু জামা-প্যান্ট পরা তাগড়াই তাগড়াই ছেলেরা। হঠাৎ মনে হল, নাচের নেশায় মাতাল ওই ছেলেদের কয়েকজনকে যেন আমাদের বিজয়া দশমীর মিছিলে দেখেছি।

বুঝলুম, এই হচ্ছে তরমুজ-উৎসব। অর্থাৎ কিনা ট্যুইসটের "গণ-নৃত্য"।

আসরের মাঝখানে মঞ্চোপরি কতিপয় তরুণ, হাতে নানারকম বাদ্যযন্ত্র, মুখে সংগীত নামধারী সেই 'হুই-হাই' আওয়াজ এবং বীটল্‌স্‌দের নকলে প্রত্যেকের কপাল-ঢাকা চুলের বাহার। ওই মঞ্চ ঘিরেই শত শত ঘোর-লাগা তরুণ-তরুণী হাত পা ছড়িয়ে নিম্নাঙ্গে ঊর্ধ্বাঙ্গে ভূমিকম্প লাগিয়ে দিয়েছে। নাচের এমনই দাপট, অনুমান করতে পারি, দেহের ভিতরকার যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই ঠাঁই বদল করে নিয়েছে।

দেহের 'আন্দোলন' বা 'বিক্ষোভ' যাই বলি না কেন, উৎসব যে চলছে, তা চোখে দেখে ততক্ষণে টের পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু 'তরমুজ' শব্দটি সঙ্গে জোড়া কেন? কারণ আছে। নাচ শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সুন্দরী নির্বাচন করে বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রেসিডেন্ট তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন মেয়েটির ঠোঁটের রঙের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া লাল টুকটুকে তরমুজের একটা টুকরো।

সেবার তরমুজ-সুন্দরীরূপে নির্বাচিত হয় প্যাট রেলীয়া নামে একটি মেয়ে। শত-সখী-পরিবৃতা রেলীয়া উপস্থিত সবাইকে স্বহস্তে বিলিয়ে দিল অজস্র তরমুজের অসংখ্য খণ্ড। যে-গিয়েছে, সে-ই পেয়েছে বিনি পয়সায়। অতিরিক্ত পেয়েছে তরমুজ-সুন্দরীর হাসির টুকরো। ফাউ।

এই খাওয়াটাকে কেন্দ্র করেই ট্যুইস্ট নাচের ওই সর্বজনীন মহোৎসব। তরমুজটা গৌণ, নাচই আসল।

নতুন চেনা দু' একজন আমাকে কনুই মেরে দাঁতখিঁচুনি ওই নাচের মাঝখানে ঠেলতে চেয়েছিল। পারেনি। আমার পাশে

ছিল ক্যাথি জুলিয়ান আর ব্রায়ান ক্যোনিগ। সেখানকারই ছাত্র-ছাত্রী। তারা তো টানাটানিই শুরু করে দিল। আমার গলা থেকে তখন প্রতিবাদের যে-শব্দ বেরোল, আসলে তা' অনেকটা 'হেলপ হেলপ' আর্তনাদেরই অনুরূপ। শেষমেষ ক্যাথি আর ব্রায়ান হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই নেমে পড়ল ওই কুরুক্ষেত্র-আসরে।

নামার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে অন্য মানুষ। এতক্ষণ বেশ সভ্যভব্যের মত কথা বলছিল, 'তাধিন-তাধিন' ঘোর লাগতেই চেনা মানুষ অচেনা।

গতিক সুবিধের মনে হল না। ব্যাপারটা ছোঁয়াচে। ক্যাথি আর ব্রায়ান যখন ও জগতে, চটুল বাজনার তাল যখন আরও উদ্দাম, নাচের লয় আরও প্রলয়ংকরী আমি চুপি চুপি বাড়ির পথ ধরলুম। কিন্তু ঘরে পৌঁছেও নিস্তার নেই, মাথার ভিতর ব্যানজো আর স্যাকসোফোন তখনও অনবরত বাজছে। আর বাজছে বীটল-গানের একটি কলি—প্লীজ, প্লীজ মি—

পরদিন প্রফেসর স্যাভেজের বাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। স্যাভেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। মাইডিয়ার লোক। সেখানে কী কুক্ষণে বলতে গিয়েছিলাম, ট্যুইস্ট নাচের ওই আসরে আমার গা গুলিয়েছে। কথা শেষ হল না, স্যাভেজের অষ্টাদশী কন্যা ভিকি আমায় প্রায় তেড়ে মারতে আসে। তার সঙ্গে যোগ দেয় কনিষ্ঠা ভারজিি আর স্যাভেজ জুনিয়র। আমার মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ— 'ইমপসিব্‌ল, কোন সুস্থ পুরুষ মানুষ এইভাবে ট্যুইস্টের নিন্দা করতে পারে না।'

তিন ছেলেমেয়ের ভাবভঙ্গী দেখে অধ্যাপক অধ্যাপকিনী হো-হো করে হাসেন, আমি মজা পাই।

ট্যুইস্টের সঙ্গে মৃগীরোগের তুলনা পুনর্বার করা মাত্র ভিকি

রেগে আগুন। বলে, "এ হতেই পারে না, আপনি নিশ্চয়ই বানিয়ে বানিয়ে বলছেন, ট্যুইস্টের কদর বোঝে না এমন লোক থাকতে পারে না এই বিংশ শতাব্দীতে।" স্যাভেজ জুনিয়র আমার দিকে এমন কটমট তাকায় সত্যযুগ আর ভারতবর্ষ হলে, নির্ঘাৎ ভস্ম হয়ে যেতাম। আর ভারজি! আমার মন্তব্যে বেচারা এমনই ম্রিয়মান যে, তাকে তখন দক্ষযজ্ঞের পটভূমিকায় সতীর মত দেখাচ্ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের ছিঁটেফোঁটা থাকলে পতি অপেক্ষা প্রিয়তম ট্যুইস্টের নিন্দায় সে সেই মুহূর্তে অবশ্যই দেহত্যাগ করত।

করেনি, উল্টে ততক্ষণে ওদের তিনজনের চোখে ট্যুইস্ট নাচের ঘোর লেগে গিয়েছে। রাধা কৃষ্ণ নামে আকুল হতেন, এঁদেরও দেখছি নামৈব কেবলম কাজ হয় এবং কোথায় রইল কফির কাপ, পুডিংয়ের বাটি, মুহূর্তে রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে তিনজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ডাইনিং টেবিলের লাগোয়া ড্রয়িংরুমে তিড়িং-লাফ, থুড়ি ট্যুইস্ট শুরু করে দিয়েছে। অবাক কাণ্ড, পঞ্চাশোর্ধ্ব গৃহকর্তা এবং গৃহিণীরও মাথা ছুলছে, ওঁরাও 'একসকিউজ মি' বলে উঠে পড়েছেন, উত্তেজনায় উত্তেজনায় মুখর বাজনার তালে তালে কোমর বাঁকাতে, হাত পা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছেন। দর্শকের ভূমিকায় ছাপোষা বাঙালী-আমি হতভম্ব।

অধ্যাপক-গৃহিণী নাচতে নাচতেই চোখের ইশারায় আমাকে দু' একবার যোগ দিতে ডাকলেন, আমি ইশারা টের না পাওয়ার ভাণ করে ঠায় বসে রইলুম।

ভেবেছিলুম, ঘরের ভিতরকার এই তরমুজ-উৎসব সারা রাত চলবে। আমার কপাল ভাল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে থেমে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

সবাই আবার জড় হলুম এক জায়গায়। অধ্যাপককে জিগ্গেস করলুম—এই মোটা শরীর নিয়ে এই কাণ্ডটা করলেন কী করে?

অধ্যাপক হেসে জবাব দেন—না করে উপায় কী, নইলে সবাই বুড়ো ভাববে যে! এদেশে কেউ বুড়ো হতে চায় না।'

এতক্ষণে বুঝলুম ব্যাপারটা। 'বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন।' এবং ঘরে-বাইরে সর্বত্র ট্যুইস্ট নাচের উপচারে সেই তরমুজ-উৎসবের প্রতিফলন। তরমুজ যৌবনের প্রতীক। নিউ ইয়র্ক থেকে লস এনজেলেস, শিকাগো থেকে নিউ অরলিয়েন্স—বিরাট জনপদ ট্যুইস্ট নাচে অভিব্যক্ত সেই শৃঙ্খলহীন যৌবনের অধীন। এমনিতে সুস্থ স্বাভাবিক, কিন্তু যেই শোনা গেল মাতাল বাজনার চটুল সুর, অমনি কোথায় তলিয়ে যায় ক্লাস, কারখানা, অফিস, বাড়িঘর। চোখের তারায় দুলতে থাকে বিশ্বজগৎ। এবং সে মুহূর্তে 'সমাজ-সংসার মিছে সব।'

এই তরমুজ-উৎসবের প্রধান পূজারী, বলাই বাহুল্য, কিশোর-কিশোরী আর তরুণ-তরুণীর দল। এদের রীতিনীতি, ধরণ-ধারণ আলাদা। সমাজের, প্রেমের ও জীবনের সংজ্ঞা এদের কাছে ভিন্ন। প্রফেসর স্যাভেজের ভাষায় 'লাভ্' নয়, এদের কাম্য 'সেক্স'। কেন? তার উত্তর: লাভ ইজ সারেণ্ডার, সেক্স ইজ কনকোয়েস্ট। হু ওয়ানট্স টু সারেনডার?

স্যাভেজ কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ব্যাখ্যা করে বলেন—এটাই হচ্ছে এই ট্যুইস্ট যুগের মূল কথা। আত্মসমর্পণে যখন এই অনিচ্ছা, তখন চল, বেরিয়ে পড়ি, মজায় মাতি। সানফ্রানসিস্‌কোর এক ট্যাকসি ড্রাইভার আমায় বলেছিল—"রোজ রাত্রে মেয়েরা আমার গাড়িতে ওঠে। বলে, যেখানে মজা, যেখানে ছেলের দল, সেখানে নিয়ে চল।

এদের উপাস্য-দেবতা একা কামদেব নন, রিংগো প্রমুখ বীটল-বালকেরাও। চুল ছাঁটছে ওদের আদলে, কথা বলছে ওদের ধরনে, গান গাইছে ওদের নকলে। ওদের এমনই জনপ্রিয়তা, মারকিন দেশ সফরের সময় ওরা যে হোটেলে রাত কাটিয়েছিল, তার

বিছানার চাদর এক লপ্তে কিনে নিয়ে এক ঝানু ব্যবসাদার এক কোটি ষাট লাখ টাকা কামিয়েছিল। বীটলদের অঙ্গস্পর্শে অমূল্য ওই চাদরের এক এক ফালি এক এক ডলারে স্যুভেনির হিসাবে বিক্রির বিজ্ঞাপন যখন কাগজে-টেলিভিশনে বের হল, তরুণ-তরুণী, বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে কী মাতামাতি। ছ দিনের মধ্যে ওই সব স্যুভেনির লক্ষ লক্ষ বুকের শোভা।

এইসব ট্যুইস্ট আর বীটলস-পাগল তরুণ-তরুণীর চেহারায় বা পোষাকে বিশেষ তফাৎ নেই। বিশেষ অনুধাবন ব্যতিরেকে বোঝার উপায় নেই কে ছেলে, কে মেয়ে। আটোসাটো খাটো পোষাক, উসকোখুসকো চুল, মুখে সিগারেট, চোখে উদ্‌ভ্রান্তি। দিনে এরা একরকম, রাতে অন্যরকম। রাত যত বাড়ে চেহারার তত বদল হয়।

স্যাভেজ একটু দম নিয়ে বলেন, শুধু তরুণ-তরুণীরাই নয়, এদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি আমরা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার দলও। দেহের স্থূলতা আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, কর্কশ ত্বক প্রসাধনে ঢেকে নাচের আসরে সমবেত হচ্ছি। ঘরভাঙানি, কুলমজানি ট্যুইস্টের ডাক ফিরিয়ে দেবার সাধ্য কারও নেই।

আমি বললুম,—ঠিকই বলেছেন, নিউ জারসির যে খবরের কাগজে আমি কিছুদিন কাজ করতুম, তার মালিককে একদিন এক ট্যুইস্ট নাচের আসরে বলেছিলাম, ধরুন, কোন রিপোর্টার বা আপনার অফিসের অন্য কোন কর্মী যদি আপনাকে এইভাবে দেখে ফেলে, যদি অপরিচিতা ওই মেয়েটিকে নাচের পর আপনার বাহুলগ্না দেখে কুৎসা রটায়? ভদ্রলোক তো হেসেই সারা—'আর ইউ কিডিং?—ঠাট্টা করছ?—এভরিবডি ডাজ ইট। হাউ এল্‌স্‌ কেন ইউ মিট এনিবডি?

আপনার স্ত্রী?

হা-হা-হা—ভদ্রলোক হেসে আকাশ ফাটান।—আরে দেখ গিয়ে, সে অন্য জায়গায় মজায় মেতেছে।

ব্যস, এক উত্তরে আমার বাক্য বন্ধ।

প্রফেসর স্যাভেজ স্ত্রীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসেন। মিসেস সে হাসিতে যোগ দেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে বলেন—এ যুগের নাচের আবার নানান ধরন। মংকি, ফ্রগ, গেরিলা, ওয়াতুসি ইত্যাদি। নাচের ঘোরে কেউ বাঁদরের মত কাল্পনিক গাছে উঠেছে, কেউ ব্যাঙের মত চার পায়ে লাফাচ্ছে, কেউ গোরিলার মত হাঁক দিচ্ছে। সে এক অদ্ভুত আদিম ব্যাপার।

প্রফেসর আর এক কাপ কফির ফরমাশ দিয়ে কথার মাঝখানেই বলেন, সবচেয়ে জনপ্রিয় অবশ্য 'হুইসকি-এ-গো-গো'। ফরাসীতে যাকে বলে ডিসকোথেক (Discotheque) সেইভাবে গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে নাচা এই উদ্‌ভ্রান্ত যুগের আর একটি লক্ষণ এবং 'হুইসকি-এ-গো-গো' এমন বাজনার সঙ্গে জমে ভাল। এই নাচের আসর যেখানে, সেখানেই ভিড় বেশি। যারা ঢুকতে পায় না, তাদের কী মাথা-চাপড়ানি। শিকাগোর রাশ এভিনিউর এক ক্লাবে ঢুকতে না পারা এক মেয়েকে চিৎকার পেড়ে বলতে শুনেছি —'হোআই আর ইউ কিপিং মি আউট, হোআই কানট আই কাম ইন? হোআই?

কিছুকাল আগে 'লুক' ম্যাগাজিন এই ট্যুইস্ট-যুগের তরমুজ-উৎসবে উদ্‌ভ্রান্ত ছেলেমেয়েদের এক সমীক্ষা করেছিলেন। তাতে ইনডিয়ানাপোলিসের একজন সমাজতাত্ত্বিক বলেছিলেন—ইট ইজ এ কাইন্‌ড্ অব ফারটিলিটি রাইট, ডিজাইনড্ টু কমব্যাট দি স্টারিলিটি অব মডার্ন এজ। আগেকার সেই হাতে হাত ধরে আলতোভাবে কোমর জড়িয়ে মৃদু বাজনার তালে নিষ্প্রভ আলোয় নাচ নয়—ইট ইজ এ সর্ট অব সেকসি ইন এ ক্লীন ওয়ে, অল দোজ বডিজ গ্রাইনডিং বাট নেভার টাচিং।

তারও চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, আর একটি মেয়ের মন্তব্য। মেয়েটি ইনডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী। সে একদিন

বলেছিল—"আমি এই নাচকে ভালবাসি, এই নাচের যুগকে ভালবাসি। তার কারণ, দে টেক্‌স্‌ অফ মাই প্রবলেম, অফ সোসাইটি ইটসেল্‌ফ। ইউ ক্যান নট থিংক এবাউট ইনিথিং এলস হোআইল ইউ আর লস্ট ইন দেম। ইউ একজস্‌ট্‌ ইওরসেল্‌ফ, দেন ইউ ক্যান ন্যাপ ফর ফিউ আওয়ার্‌স্‌ উইদাউট এ স্লিপিং পিল।" অবসাদ আর ক্লান্তিতে বড়ি না গিলেই আরামের ঘুম।

মনে আরাম নেই, সংসারে শান্তি নেই, সমাজে সুখ নেই। হয়ত তারই সন্ধানে এযুগের ছেলেমেয়েরা, আমরা ছুটে চলেছি। আরাম, শান্তি বা সুখ পেয়েছি কিনা বলতে পারব না, তবে অশান্তি-অসুখ খানিকক্ষণের জন্য ভুলতে পারি। মদের নেশার চেয়ে এ ঢের ভাল।

প্রফেসার স্যাভেজ থামলেন। হঠাৎ খেয়াল হল ভিকিরা নেই। জিগ্‌গেস করি, ওরা কোথায়?'

মিসিস বলেন, 'ভিকি, ভারজিি দুজনেই বেরিয়ে গিয়েছে। আজ শুক্রবার যে! জানেন না, ফ্রাইডে নাইট ইজ পিক আপ নাইট। ভাল কথা, আপনাকে আর এক কাপ কফি দেব?'

বললুম—"না, ঘুম পাচ্ছে।"

"এত তাড়াতাড়ি"—মিসেস স্যাভেজের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা—"রাত তো মোটে আড়াইটা!"

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিই। অপরাধী মনে হল নিজেকে। কী 'বর্বর' আমি, ট্যুইস্ট নাচের ধকল কিংবা স্লিপিং পিল ছাড়াই আমার দু' চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে!

ওদিকে দূর থেকে কাদের যেন খিল খিল হাসির আওয়াজ। হয়ত আর একটা তরমুজ-উৎসবের গৌরচন্দ্রিকা। রাত তো মোটে আড়াইটা।

আমেরিকান কেতা

প্রশ্ন শুনে অবাক। আশ্চর্য ব্যাপার তো, ভদ্রমহিলা জ্যোতিষী নাকি! আমেরিকানরা আমাদের অনেকের হাঁড়ির খবর রাখে জানা ছিল, মনের খবরও যে রাখে জানতুম না। ইউনিভারসিটির কাফেটারিয়ায় সককাল বেলা ঢুকতেই টমেটোর মত গোলগাল কাউনটারে যিনি বসে থাকেন, বর্ণ-বর্গের পঞ্চম অক্ষরগুলো অকাতরে উচ্চারণে ঢেলে জিগগেস করলেন—'হাঁউ আঁর ইঁউ দিঁস মঁরনিং?'

সানুনাসিক ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল, ওটা মারকিনী ধরন, কিন্তু আমি যে কাল সারা রাত পেটের ব্যাথায় চিঁ চিঁ করেছিলুম এবং এখনও অকুস্থলে 'চিন চিন করছে, তার খবর ওই অপরিচিতাটি জানলেন কী করে?

এক্ষেত্রে জবাব কী দেওয়া উচিত ঠাহর করতে না পেরে দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করলুম। ভদ্রমহিলা আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে আমাকে ছেড়ে অন্য খদ্দেরে মন দিলেন।

ব্রেকফাস্ট সেরে জারনালিজম বিভাগের বাড়ি আরনি পাইল হলের দিকে যেতেই প্রফেসার ক্যালাওয়ে'র সঙ্গে দেখা। আবার অবাক! ক্যালাওয়ে দূর থেকেই চেঁচিয়ে উঠেছেন—"হা—ই, হাঁউ আঁর ইঁউ দিঁস মঁরনিং? এবারও কিছু জবাব দিলুম না। আগের মত কেঠো হাসি চালিয়ে অন্য পথ ধরলুম। মনে মনে ভাবলুম, আমেরিকানদের ক্ষমতা আছে বটে, কোথায় ইনডিয়ার একটি ছেলে ইউনিয়ন বিলডিংয়ের চার শ একুশ নম্বর ঘরে পেট ব্যথায় আগের রাত কাটাল, আর ভোর না হতেই জনে জনে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে!

আরনি পাইল হলে আসতেই ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক সবার মুখে সেই এক প্রশ্ন, কেমন আছি আজ সকাল বেলা। আচ্ছা, আমার পেছনে গোয়েন্দা-ফোয়েন্দা লাগায়নি তো? বলা যায় না, ওদের এফ-বি-আই যা ধুরন্ধর প্রতিষ্ঠান, হয়ত আমার ঘরের দেয়ালে যন্ত্রটন্ত্র লাগিয়ে পেটের খবরও পাকড়াও করে নিচ্ছে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। চেনা অচেনা যার সঙ্গে দেখা হয়, সবাই সেই একই কথা পাড়ে।—হাউ আর ইউ দিস্ নুন? এল বিকেল। —হাউ আর ইউ দিস আফটারনুন? সন্ধের প্রশ্ন—হাউ আর ইউ দিস ইভনিং?

আমি স্থিরনিশ্চয়। নইলে সব শেয়ালের এক রা কেন। নাকি প্রথম সম্ভাষণের এইটেই বোল-চাল? উঁহু, ইংল্যানড আর পশ্চিম ইউরোপের এনতার জায়গা ঘুরেছি, সেখানে তো অন্য কেতা, কুশল-বিনিময়ের শুরু হাউ ডু-ইউ ডু দিয়ে।

শেষমেষ আর পারলুম না, প্রফেসার ফারার-এর বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণে মিসিস ফারার সেই অনিবার্য প্রশ্নটি জিগগেস করতে কাষ্ঠ হাসি বরবাদ করে সবিস্তারে নিবেদন করলুম— "এখন ভাল আছি, কাল রাত্তিরে শরীরটা, মানে এই একটুকু, যাকে বলে (ওরে বাবা, পেট ব্যথার ইংরেজি আবার না জানি কী), মানে পেটের ভিতর হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড়—"

মিসিস ফারার চোখ কপালে তুলে দাঁত আর সিগারেটের ফাঁক দিয়ে সহানুভূতির মলমমাখা মিহিসুর ছাড়েন—'ওহ, হোআট এ শেম।' তারপরেই চিৎকার পাড়েন—'হানি, হানি, হানি—'

আবার চিন্তায় পড়লুম। পেট ব্যথায় এরা মধু খাওয়ায় নাকি? হবেও বা, মারকিন রীতিনীতিই দেখছি সব আলাদা।

না, ভদ্রমহিলার ডাকে কোন মধু-র বোতল এল না, তার বদলে দোতলা থেকে নেমে এলেন মিসটার ফারার। এবং তাঁর হাতে, লক্ষ্য করলাম, কোন শিশিটিশিও নেই। ফারার সাহেব

আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন "হা—ই, হাউ আর ইউ দিস্ ইভনিং।"

মিসিস ফারার সোফায় একখানা হাত এলিয়ে দিয়ে স্বামীকে জানালেন—"ওঁর শরীরটা ভাল নেই।"

ফারার সব শুনে বললেন, "আর ইউ কিডিং হানি ?"

সব ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকল। উনিও দেখছি মধু-র কথা বলছেন! এদিকে ফারারসাহেব অন্য ঘরে গিয়ে এক লাফে ফের এসে সামনে দাঁড় করালেন হুইসকির বোতল—কেনটাকি বুরবন। বললেন—"একটু খাও, শরীর চাঙা হবে।"—এবারে বুঝলুম, হুইসকিকেই এঁরা তাহলে হানি অর্থাৎ মধু বলেন।

ঘোড়ার ডিম বুঝেছি। পরদিন আমার দীর্ঘকালের সুহৃদ শান্তিনিকেতনের সহপাঠী, পূর্ব পাকিস্তানের নামী কবি আশরাফ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা। আশরাফ ওখানে ব্লুমিংটনের ইনডিয়ানা ইউনিভারসিটিতে লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছে। বললে—তুই একটা আস্ত গাধা, কাঠ বাঙাল। মারকিন মুলুকে নতুন এসেছিস তো, তাই ওঁদের কথাবার্তায় অমন ভ্যাবা গঙ্গারাম বনছিস। গোড়ায় আমারও তাই হয়েছিল। 'হানি' মধু হতে যাবে কেন। ওটা হল গিয়ে আদরের ডাক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্বোধনের বুলি। কখনও 'হানি', কখনও 'শুগার'।

আমি বললুম—'কী জানি ভাই, সিনেমা কম দেখি, মারকিনী বই পড়ার অভ্যেসও কম, এসেছিও এদেশে নতুন, তাই বোকা বনে আছি। বউকে কখনও মধু বা চিনি বলিনি।'

'হাউ আর ইউ-'য়ের ধাঁধাটাও বললুম। আশরাফ হাসতে হাসতে বলে,—"আমারও গোড়ায় তা'ই মনে হয়েছিল। ওটা হচ্ছে 'হাউ-ডু-ইউ-ডু'এর মারকিন সংস্করণ, দেখা হলেই বলবে। আর বুঝেছিস, এখানে যতদিন থাকবি, 'হায়-হায়' করে তোর অষ্ট-প্রহর কাটাতে হবে। ওরা হ্যালো-ট্যালো-র ধারে কাছে নেই।

উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে—'হা—ই।' এলিয়ে দেওয়া উচ্চারণে শোনায়—হা-য়।"

সব শুনে লজ্জায় মরে যাই। এফ-বি-আই চুলোয় যাক, মিসিস ফারারকে আমার পেট ব্যথার কথাটা বলতে গেলুম কেন। —ই—স! না, এবার থেকে সাবধান হতে হবে।

কিন্তু এমনই কপাল, মারকিন বুলির চোটে পার পাওয়া মুশকিল। একে ওদের উচ্চারণ সামাল দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, উপরন্তু এমন শব্দ শুনি, যার মানে বের করতেই আমার ইংরেজি বিদ্যের জাহাজ মাঝ-দরিয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে।

এলিভেটর মানে লিফট, গ্যাসোলিন পেটরোল, ফনোগ্রাফ গ্রামোফোন ইত্যাদি কিছু কিছু রপ্ত করেছি, কিন্তু দেখছি, মারকিন অভিধান ধাতস্থ করা অনেক দিনের কাজ। গিয়েছি প্রফেসার আরপানের বক্তৃতা শুনতে। সাংবাদিকতা নিয়ে চলছে আন্তর্জাতিক সেমিনার। ভারত থেকে আমি এবং আরও আঠারোটি দেশের প্রতিনিধি একসঙ্গে আছি। বক্তৃতা আর প্রশ্নাবলীর পালা শেষ হতেই প্রফেসার আরপান আমার দিকে চেয়ে বললেন—"নাউ আমিট, হীয়ার ইজ ইওর স্কেজিউল ফর টুমরো।"

স্কেজিউল! সে জিনিসটা আবার কী? তাও আবার আগামী-কালের স্কেজিউল! আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ঈস, সঙ্গের সবাই নিশ্চয় আমাকে অশিক্ষিত মূর্খ ভাবছে। আমি অন্যমনস্কতার ভাব সারা চোখেমুখে এনে প্রফেসারের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রইলুম। আরপান আবার বললেন—"হীয়ার ইট ইজ, ইওর স্কেজিউল।"

এক ফালি কাগজ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। দেখলুম কাগজের ফালিতে আমার আগামী দিনের কার্যতালিকার রুটিন টাইপ করা।

ব্যাপারটা মালুম হল। অ্যাদ্দিন যাকে বলে এসেছি শিডিউল, এখানে এসে আমায় বলতে হবে স্কেজিউল, অন্তত পক্ষে স্কেডিউল।

স্কেজিউল বলাতে আমার যেমন গায়ে কালঘাম ছুটেছে, শিডিউল বললে তেমনি গোটা মারকিন মুলুক হাঁ করে থাকবে। ডেটরোয়েটে একজনকে জিগগেস করেছিলুম "তোমরা স্কেজিউল বল কেন?" জবাব শুনলুম—আই হ্যাভ লার্নট দিস ইন মাই স্কুল।—অর্থাৎ কিনা উনি ওটা ওঁর স্কুলে শিখেছেন।

মারকিন কেতা জানা না থাকলে বিপদ অনেক। শুধু ভাষায় নয়, নানা ব্যাপারে। তবে কিছুদিন থাকলেই সব বোলচাল, সব কেতা-কানুন সড়গড় হয়ে যায়।

সড়গড় যে হয়েছে, তার ছাপ প্রথম ফোটে পোষাকে। মেপে মেপে কথা বলা, আর চেপে চেপে পথ চলা দেখলেই টের পাওয়া যায়, এতদ্দেশে মহাশয়ের আগমন সাম্প্রতিক। তেল চুকচুক কেতাদুরস্ত চেহারা দেখলেই ধরে নেওয়া যায়, ইনি কোন বিদেশী ছাত্র বা অধ্যাপক। এবং তিনি সবে এদেশে পা দিয়েছেন।

তবে ভোল পালটাতে বেশিদিন লাগে না। কয়েক মাসের মধ্যেই ওদেশী কথা যেমন রপ্ত হয়, তেমনি খোলস ছাড়তে ছাড়তে কয়েক হপ্তায় মারকিনী চেহারাও বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে বাদ পড়ে কোটের পকেটে রুমালের উঁকিঝুকি, দ্বিতীয় হপ্তায় বাদ পড়ে কোট নেকটাই। তৃতীয় হপ্তায় শার্টের হাতা লাফিয়ে ওঠে কনুইয়ে উপর। চতুর্থ হপ্তায় তেলচুকচুক কালো চুলের রাশ মাথা থেকে বেমালুম বেপাত্তা, তাঁর বদলে কদম ফুলের বাহার। পঞ্চম হপ্তায় শার্টের নির্বাসন ওয়ার্ডরোবে, গায়ে চড়ে ভারসিটি ব্লেজার এবং অবশেষে ষষ্ঠ হপ্তায় গোড়ালির গোড়ায় লাথি মেরে ট্রাউজারও উঠে পড়ে হাঁটুর উপরে। সব মিলিয়ে ছ মাসের

মাথায় আপাদমস্তক মারকিনী ছাপ—বিদেশী অতিথি একেবারে 'মিসটার আমেরিকা।' এবং তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে বেরোবে—'হা—ই।'

মোট কথা ভাষার আর পোশাকের ধাক্কা সামলে উঠতে পারলে মারকিন-প্রবাস অনেক সহজ। আবার মাস ছয় পার করেও অনেক সময় দেখা যায়, অনেক কিছুই ধাতস্থ হচ্ছে না। ইনডিয়ানা ইউনিভারসিটির জারনালিজম বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে একটি :ক্লাস করেছিলুম। ক্লাসের রকমসকম দেখে আমার চক্ষু চড়ক গাছ! কলকাত্তাই বাঙাল, তাই ক্লাস শুরুর আগেভাগেই ঘরে ঢুকেছি। দেখি ডেসকের উপর সারি সারি ছাইদানি। কী ব্যাপার, অধ্যাপকদের কমনরুমে ঢুকে পড়লুম না তো?

সন্দেহ নিরসন হল মুহূর্তে। 'হা—ই হা—ই' করতে করতে একপাল ছেলেমেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। সব জোড়ায় জোড়ায়। সোজা ভাষায় প্রত্যেক ছেলের বগলদাবায় এক একটি মেয়ে। দু তরফের পোশাকই উপর এবং নীচ দুদিক থেকে কমতে কমতে একজায়গায় মিলব-মিলব করছে। আর প্রায় সকলের মুখে আগুন।—সিগারেট জ্বলছে!

প্রফেসার এলেন, ক্লাশ বসল, বক্তৃতা চলল, সিগারেট তবু জ্বলছে। কোন অস্বাভাবিকতা নেই। এবং আরও তাজ্জব-কি-বাত, চেয়ে দেখি মেয়েগুলো ছেলেদের সঙ্গে জড়াজড়ি করেই বক্তৃতার নোট টুকছে। অনেকে প্রায় সহপাঠীর কোলের উপরেই। প্রফেসরের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, অন্য কারও চিত্তবৈকল্য নেই, আমিই কেবল লজ্জায় চোখ দুটোকে ব্ল্যাক বোর্ডে আটকে রাখার চেষ্টা করছি। আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, কো-এডুকেশনের মক্কায় শিক্ষাদীক্ষা, তবু এতটা "প্রগতি" আশা করিনি। (শুনেছি, কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়েরই

প্রেসিডেণ্ট সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর ইউনিভারসিটি ক্যামপাসে অসংখ্য ঝোপঝাড়, নিরিবিলি জায়গা এবং সেখানে বেঞ্চিগুলো এমন মাপে তৈরি করে বসানো হয়েছে যে, দুজনের বেশি একসঙ্গে বসতে পারে না। বলা বাহুল্য, দুজন বলতে দুই পুরুষ বা দুই নারী তিনি বোঝাননি।)

এতো গেল নিরামিষ ব্যাপার। রামধাক্কা খেলুম একদিন খেলার মাঠে। ক'দিন থেকেই হই হই ব্যাপার। ইনডিয়ানার সঙ্গে নর্থ ওয়েস্টারনের ফুটবল খেলা। ব্লুমিংটনের স্টেডিয়ামে। ফুটবলের নাম শুনে, আমি উল্লসিত। যাক, এতদিনে চেনা একটা ব্যাপার দেখা যাবে।

মাঠে গিয়ে কিন্তু আবার বোকা বনলুম। আমাদের ফুটবল আর মারকিন ফুটবলে আসমান-জমিন ফারাক। এদেশে নামেই ফুটবল, কুষ্মাণ্ডাকৃতি যে গোলাকার পদার্থটি নিয়ে মাঠে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড চলে, তার সঙ্গে 'ফুট'-এর তেমন সম্পর্ক নেই। দু ঘণ্টা খেলার ফাঁকে ব্যানড্, সুন্দরী মেয়েদের ড্রিল। আর খেলোয়াড় পরিচয় নিয়ে মাঠে যাঁরা লড়াই করতে নামলেন, তাদের পোশাকের উপর দিক এসট্রোনটের, তলার দিক বুলফাইটারের। ইয়া তাগড়াই চেহারার গুণ্ডা প্রকৃতির কতকগুলো লোক মাঠে যা গুঁতোগুঁতি ঘুঁষোঘুঁষি করল, তাকে আর যাই বলা হোক, ফুটবল বলা চলে না।

খেলার কিছুই বুঝলুম না। শুধু মনে হল পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমের কোন কলোসিয়ামে বসে ষাঁড়ে-মাতাদোরে লড়াই দেখছি।

খেলার পর সঙ্গী মারকিন বন্ধুটি বললেন, 'চল, তোমাকে কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি!'

ভয়ে ভয়ে ড্রেসিং রুমের দিকে গেলুম। দু' তরফের কাপ্তান এলেন এগিয়ে। দুজনেই হাত বাড়ালেন হ্যাণ্ডশেক করতে। দুটো থাবার দিকে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠলুম। সর্বনাশ, আমার

আঙুলগুলো এবার গেল। কিন্তু বিদেশে ভারত-মাতার মর্যাদা রাখতে বীরের মত হাত বাড়িয়ে দিলুম। একটা হিংস্র থাবার আড়ালে আমার গোটা হাত নিরুদ্দেশ। তারপর কয়েকটি শব্দ—মড় মড় মড়।

হাত যখন ফেরত এল, আঙুলে আর হাড়গোড় কিচ্ছু নেই, সব ঝুলে পড়েছে। বুঝলুম বাংলার 'করমর্দন' শব্দটিও এই বাঘা হ্যাণ্ডশেকের কাছে অতি মোলায়েম।

'উঃ আঃ' করতে করতে যখন আরও সামনে এগিয়েছি (বলা বাহুল্য, হাত দুটো পকেটে পুরে), দেখি, এক অসম্ভব দৃশ্য। সাদা এবং কালো চামড়ার অতিকায় দৈত্যগুলোর সব কটি পূর্ণ উলঙ্গ। ঘুরছে, ফিরছে, কথা বলছে, অটোগ্রাফ দিচ্ছে এবং কয়েকজন স্পোর্টস রিপোর্টার ওইভাবেই ওদের ইনটারভিউ নিচ্ছেন। আমি চোখ বুঁজলুম।

পরে জানলুম, এটাই স্বাভাবিক। এতো খেলার স্টেডিয়াম, ছেলেদের হোসটেলের বাথরুমগুলোও বে-আবরু। কোন আগন্তুক এলে নির্দ্বিধায় স্নানের জল গায়ে সোজা বেরিয়ে আসতে বাধা নেই।

সঙ্গী মারকিন বন্ধুটিকে বললুম—আর আলাপে কাজ নেই ব্রাদার, চল বাড়ি যাই। একে আঙুলের ব্যথা, তদুপরি চোখের যন্ত্রণা।

ঘরে ফিরে দেখি, একটা চিরকুট। আজ রাত দেড়টায় হ্যাসন-দম্পতির গৃহে নিমন্ত্রণ। সম্প্রতি আলাপ, থাকেন ব্লুমিংটন থেকে মাইল আশী দূরে। চিরকুটেই লেখা, তুলে নিয়ে যাবেন, ফেরত দিয়ে যাবেন।

অদ্ভুত ব্যাপার! রাত দেড়টায় আবার কীসের খানা-পিনা, তাও আশী মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে?

পরে জানলুম, এটাও একধরনের মারকিন কেতা, ওদের কাছে

রাত দেড়টা, আশী মাইল, কিছুই না। কিন্তু পেটের ব্যথা না হয় নেই, আঙুলের ব্যথা যে ক্রমেই বাড়ছে। ঠিক করলুম যাব না।

চিরকুটে হ্যাসনদের টেলিফোন নমবর লেখা ছিল। নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখানের ভাষাটা ইংরেজিতে কেমন হয়, বার তিন মনে মনে মক্‌স করে রিসিভার তুললুম। ডায়াল করতেই ওপাশে পাখির গলার মত সরু আওয়াজ। মিসিস হ্যাসন কথা বলছেন।

পরিচয় দিতেই রিসিভারে ভেসে এল-'হাউ আর ইউ দিস ইভনিং?"

এতদিনে সব জেনে ফেলেছি, চুয়িং-গাম চুষে কথা বলার কায়দায় একটু বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নাকিসুরে চটপট জবাব দিলুম—ফাঁইন, হাঁউ আঁর ইঁউ?

মারকিন-কেতা রপ্ত করার আনন্দে নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখানের কথাটা বলতে ভুলে গেলুম। আঙুলের ব্যথাও ভুলে গেছি।

সেই মেয়েটি

আলোচনার বিষয় মুখরোচক। মারকিন-নারী। মারকিন দেশের ক'জন অবিবাহিতা অসতী ও সহজ-লভ্যা, সে বিষয়ে রসমধুর গবেষণা চালাচ্ছে গ্যালাঘার। তার সঙ্গে ফোড়ন কাটছে রাল্‌ফ। দু'জনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সেই আলোচনাকে আরও সারগর্ভ, আরও সরস করে তুলেছে। আমি শ্রোতা।

রাল্‌ফ সোডা আর নীল গ্যালাঘার—দু'জনেই আমার সহকর্মী, নিউ ব্রানসউইকের 'দি হোম নিউজ' কাগজের রিপোর্টার। নিউ জার্সির এই শিল্পপ্রধান শহরের খবরের কাগজটিতে আমি কাজ করতে এসেই রাল্‌ফ আর গ্যালাঘারের মত দু'জন মাইডিয়ার বন্ধু পেয়ে যাই। নিউ ব্রানসউইক নিউ ইয়র্ক থেকে মাইল চল্লিশ দূর।

গ্যালাঘার বললে, গত বছর সমীক্ষা চালানো হয়েছিল মারকিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। দেখা গিয়েছে, শতকরা ৭৬টি মেয়ে বিয়ের আগেই বিয়ের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে। ইউনিভারসিটি ক্যামপাসগুলোয় যা কাণ্ড চলে, বুঝলে ভায়া, কিছুদিন ঘুরলেই দেখতে পাবে।

রাল্‌ফ বললে, না নীল, শুধু ক্যামপাস গুলোর দোষ দিও না, বাড়িতেও একই অবস্থা। শুক্রবার রাত্তিরে মেয়ে বাড়ি থাকলে মা ভেবে সারা। কী ব্যাপার, কিছু অঘটন ঘটল নাকি। শুক্রবার উইক-এণ্ডের রাত শুরু। মা ভাবেন সব বাড়ির মেয়ে ছেলে-বন্ধু নিয়ে ফুর্তি করতে বেরিয়েছে, ফিরবে রাত কাবার করে। আর আমার মেয়ে কিনা পড়ার ঘরে বসে সময় মাটি করছে। অবশ্যি

মায়ের দোষ নেই, উইক-এণ্ডের রাত বাড়িতে কাটানো ব্যতিক্রমই বটে!

কথায় কথা বাড়ে। আমি রাল্‌ফকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ শ্রীমান। আজ আমার ওখানে তোমার যাওয়ার কথা ভুলে গেলে নাকি?

আমার কথায় হুঁশ হল দু'জনের। পাঁচটা বাজে। সান্ধ্য-কাগজ, অফিস ছুটি হয়েছে চারটায়। আড্ডা মারতে মারতে এক ঘণ্টা কাবার।

তিনজনে বেরোলুম। গ্যালাঘার ওর গাড়িতে উঠে বাড়ির পথ ধরল। ও যাবে প্রিন্সটনের দিকটায় কেনডাল পার্কে। আমি উঠলুম রাল্‌ফের গাড়িতে। সোজা চলে এলুম আমার আস্তানায়।

আমি থাকি ইউনিয়ন স্ট্রীটে। একেবারে খাস বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায়। যাকে বলে ইউনিভারসিটি ক্যামপাস। গ্যালাঘার জানে না, ইতিমধ্যেই কলেজ-ছাত্রীদের কাণ্ডকারখানা অনেক কিছু আমি দেখে ফেলেছি।

ইউনিয়ন স্ট্রীটে আমি থাকি পেয়িং গেস্ট হয়ে। রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দু'চার জন ছাত্র থাকে ওই বাড়িতে।

আমার ঘরে রাল্‌ফ মারকিন মেয়ে সম্পর্কে আর এক দফা জ্ঞান দিল। এ-দেশের মেয়েদের নৈতিক অবনতি কত সুদূর প্রসারী সে বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতাই প্রায় সে ফেঁদে বসল। বলল, এক এক সময় তাই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, ভাবি এদেশ ছেড়ে পালাই। আমার স্ত্রীরও ঘেন্না ধরে গিয়েছে এখানকার সমাজে। লানা-র সঙ্গে তোমার একদিন আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে ও অন্য-রকম। শুনেছি তোমাদের ইনডিয়ায় এসব নেই। ওখানে জায়গা দেবে আমাদের দু'জনের?

'নিশ্চয়, নিশ্চয়'—আমি সানন্দে সম্মতি দিয়ে বলি—'ঠিকই

বলেছ রাল্‌ফ, আমাদের দেশের নীতিজ্ঞান অন্য রকম, বিশেষ করে গ্রামে, তবে তোমার বউকে মাথায় সারাক্ষণ দেড়হাত ঘোমটা টেনে থাকার জন্য তৈরি হতে বল।

ঘোমটা! সে আবার কী, রাল্‌ফ আকাশ থেকে পড়ে।

আমি সবিস্তারে আমার দেশের বিপরীত দিকটা বলি। রাল্‌ফ হতাশ হয়ে পড়ে। বলে, এও কম মারাত্মক নয় দেখছি, তার চেয়ে বরং চল, আপাতত একটু বাইরে বেরোই।

'বেরোতে পারি এক শর্তে। কী রকম?'

'গাড়ি নয়, হাঁটব। তোমাদের দেশে হাঁটার আর সুযোগ পাচ্ছিনা।'

রাল্‌ফ হেসে বলে—ঠিক আছে, চল খানিকক্ষণ হেঁটেই আসি, তারপর ফিরে এসে বাড়ি যাব, আমার বাড়িতো বেশি দূরে নয়। গাড়ি এখানেই থাকুক।

দু'জনে আবার বেরোলুম। রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনান্ত ছুটি খানিক আগে হয়ে গিয়েছে। যে যার ঘরে ফিরছে। বই খাতা হাতে সব জোড়াজোড়া। মেয়েদের কেউ দয়িতের বাহুলীনা, কেউ বক্ষলগ্না। ওদের খিলখিল হাসির আওয়াজ পেছনে ফেলে আমরা শহরের দিকে এগিয়ে চলি।

অক্টোবরের শেষ। হৈমন্তী 'ফল'-এর ফসল গাছের পাতার রঙ বদলানোর পালা শেষ। এবার পাতা খসানোর সময়।

ইউনিয়ন স্ট্রীট, আর কলেজ এভিনিউ ছেড়ে সামনে খানিক এগিয়ে পৌঁছলুম লাইব্রেরির সামনে। চারধারে গাছ আর গাছ। গাছের তলায় তলায় বেঞ্চি। বেঞ্চিতে আবার সেই জোড়া-জোড়া। দুজনে মুখোমুখী।

রাল্‌ফকে বললাম—না, আর এখানে নয়, বেশিক্ষণ থাকলে চিত্তে বিকার দেখা দিতে পারে।

কেন, ভয় কীসের?—রাল্‌ফ বলে, চাও তো তোমার সঙ্গে, এসো, কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

আমি ভয় পেয়ে বলি—সে বাবা কাজ নেই। শিকাগোর সেণ্ট ক্লেয়ার হোটেলে রাত দেড়টায় আমার ঘরের দরজায় কে যেন টোকা মারে। দরজা খুলে দেখি জ্বলজ্যান্ত একটি মদিরাক্ষী মারকিন যুবতী। কোথায় ঘরে এনে আদর করে বসাব, আমার তখন বুক দুরুদুরু। ভয়ের ছোটে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কাওয়ার্ড—রাল্‌ফ দাঁতে দাঁত ঘষে বলে।

না হে না, কাওয়ার্ড নই, বিদেশ-বিঁভুইয়ে কোন প্রকার এড্‌-ভেনচারে আমি নারাজ—আমার সাফ জবাব।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হব-হব। নিউ ব্রান্সউইক আলোর মালায় উজ্জ্বল। আর গাছের অজস্রতায় আলো আঁধারির খেলা। আমরা এদিকে রেলপুলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। ঢালু নেমে পুল পেরিয়ে সামনে এগোতেই রেল স্টেশন।

রাল্‌ফের আবার সকৌতুক জিজ্ঞাসা, কিন্তু কোন লাস্যময়ী মারকিনীর সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করতে তোমার আপত্তি নেই তো?

তা থাকবে কেন—আমি বীরপুরুষের ভাব দেখিয়ে বলি।

আমার কথা শেষ হল না। রেল স্টেশনের টেলিফোন-বুথ থেকে ফিটফাট একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ঠিক আমাদের সামনে পথ দিয়ে সোজা হনহন করে চলল। পেছন থেকে দেখেই টের পেলুম অসামান্যা সুন্দরী। হাঁটার ধরনে যৌবন উপচে উপচে পড়ছে। আমি তন্ময়।

আমার ধরনধারন দেখে রাল্‌ফ, মুচকি হাসল। বলল—ওহে ইনডিয়ান ইয়োগী, কী ব্যাপার, চোখে তোমার কীসের নেশা?

রাল্‌ফের প্রশ্নে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলুম। রাল্‌ফ আবার বলে, জানা আছে সব সাধুপুরুষকে। আলাপ করবে নাকি মেয়েটির সঙ্গে?

দূর, আলাপ করব কেন? আর আমরা আলাপ করতে চাইলে ওই-বা রাজী হবে কেন?

চাও তো আলাপ করিয়ে দি, চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটি সুবিধের নয়, চল, ওকে 'ফলো' করা যাক।

রাল্‌ফের কতাবার্তায় মনে হল, আজ সন্ধ্যায় ওর কোন একটা এডভেনচার করার মতলব।

ওদিকে মেয়েটি এক ডিপারটমেণ্টাল স্টোরসের সামনে দাঁড়িয়ে উইনডোশপিং শুরু করেছে। রাল্‌ফের পরামর্শে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লুম। মেয়েটি আবার চলতে শুরু করল। রাল্‌ফের নির্দেশ মত আমরাও পেছন পেছন চললুম। মেয়েটি থামে তো আমরা থামি, মেয়েটি চলে তো আমরা চলি।

এবার মেয়েটি ডাইনে বাঁক ঘুরল। আমরাও ঘুরলুম। বলা বাহুল্য, মেয়েটি আমাদের দেখতে পায়নি

রাল্‌ফের মুখে দুষ্টুমির হাসি। বলে, মেয়েটি দারুণ খুবসুরৎ দেখছি, যেমন চাউনি, তেমনই চলন। মনে হচ্ছে, ডাকলেই সাড়া দেবে।

কী করে বুঝলে?—আমি ততক্ষণে রাল্‌ফের অধীনে এসে গিয়েছি।

বুঝব না কেন,—রাল্‌ফের চটপট জবাব—এদেশের মেয়েদের নাড়ী নক্ষত্র চিনি। কে ভাল, কে খারাপ, আমরা এক ঝলকে বুঝতে পারি। দেখ দেখ, মেয়েটা ঝুঁকে কী যেন দেখছে। আঁটোসাঁটো পোষাকে এই রকম ঝুঁকলে যা দারুন—

রাল্‌ফের উচ্ছ্বাস হঠাৎ বাধা পেল। মেয়েটি আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। রাল্‌ফ আর আমি একটু আড়াল করে দাঁড়ালুম। না, আমাদের দেখতে পায়নি। মেয়েটি চৌমাথা পার হয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরেছে।

আমরাও আবার পিছু ধরলুম। রাল্‌ফ বললে,—আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই।

সিনেমা হলটার সামনে মেয়েটা দাঁড়াল। ষণ্ডা-চেহারার দুটি লোক ওখানে ছিল। খানিক দূর থেকে আমরা দু'জনেই দেখলুম—হাসতে হাসতে কী সব কথা বলল মেয়েটি ওদের সঙ্গে। এক-জনের কাঁধে হাত পর্যন্ত রাখল কথা বলতে বলতে।

রাল্‌ফ ফিসফিস করে বলে—কী, ঠিক বলেছি কিনা। নির্ঘাৎ মেয়েটি ফ্লারটিং টাইপ।

আবার যাত্রা শুরু। মিনিট দুই পর একটা ছোট, রাস্তার লাগোয়া দোতলা বাড়ির ভেতরে মেয়েটি ঢুকে পড়ল।

রাল্‌ফ বলল—চল, আমরাও ঢুকে পড়ি।

না-না-না-দরকার নেই—আমি প্রবল আপত্তি জানাই—বরং চল, আমার বাড়িতে ফিরি। কথা ছিল খানিকক্ষণ বেড়াবার। প্রায় এক ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল অনর্থক ওই মেয়েটার পেছন পেছন।

অনর্থক কেন বলছ—রাল্‌ফ উত্তর দেয়—এসো না আজ তোমাকে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা করিয়ে দিই। এদেশে এলে, আর কিছুই করলে না, তোমার দেশী বন্ধুরা পরে বলবে কী?

আমার কোন ওজর না শুনে রাল্‌ফ আমাকে হিড়হিড় করে টেনে তুলল বাড়ির ভেতরে। সামনেই দোতলা যাবার সিঁড়ি।

এক একটা সিঁড়ি ভাঙছি, আর আমার বুকের ধুকপুকুনি বাড়তে শুরু করছে।—আচ্ছা রাল্‌ফ, সত্যি সত্যি যদি মেয়েটি খারাপ না হয়, তাহলে তো ভীষণ বিপদে পড়ব—

আরে না-না-ভয় পাবার কিছু নেই—রাল্‌ফের উত্তরে কোন উত্তেজনা নেই।

আচ্ছা রাল্‌ফ, মেয়েটি কিছু জিগগেস করলে কী বলব?

রাল্‌ফ হাসে, বলে—ও, ইচ্ছেটা এতক্ষণে চাগিয়ে উঠেছে দেখছি। তা তোমার কিছু করতে হবেনা, আমিই সব ম্যানেজ করব।

আচ্ছা রাল্‌ফ, মেয়েটি টাকাকড়ি চাইবে না তো, আমার কাছে কিন্তু বেশি ডলার নেই।

আমার অনবরত প্রশ্নে রাল্‌ফ খেঁকিয়ে ওঠে—চুপ করতো দেখি, আমার পকেটে ঢের ডলার আছে। অবশ্যি তার একটিও লাগবে না। মেয়েটি এমনিতেই ধরা দেবে। দেখলে না, সিনেমা হলের সামনে কী রকম ঢলে ঢলে কথা বলছিল।

সিঁড়িভাঙা শেষ। তু'জনেই দোতলায় হাজির, দোতলায় একটি মাত্রই ফ্ল্যাট। রাল্‌ফ দেখেছে, মেয়েটি দোতলাতেই উঠেছে। আর ফ্ল্যাট যখন একটি মাত্রই তখন খোঁজাখুঁজির ঝামেলাও নেই। রাল্‌ফ কলিং বেল টিপতে যাচ্ছে। আমি বাধা দিলুম।—ধরো, ওর মা-বাবা যদি বাড়ি থাকে, আর আমাদের দেখে তাড়িয়ে দেয়—

রাল্‌ফ—আমি জানি, কেউ নেই।

আমি—ধর, যদি মেয়েটির অন্য কোন বন্ধু ভিতরে থাকে?

রাল্‌ফ—আমি জানি, তাও নেই।

আমি—কিন্তু, কিন্তু—

রাল্‌ফ—আবার কিন্তু কীসের?

আমি—না ভাই ফিরে চল।

রাল্‌ফ—তা কী করে হয় এত কাছে এসে ফিরে যাওয়া যায় না।

আমি—কিন্তু—

সর্বনাশ, আমার কিন্তুর অপেক্ষা না করে ওদিকে রাল্‌ফ বেল টিপে দিয়েছে।

বাজনা থেমেছে। এক-তুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়—এখনই দরজা খুলে যাবে—হায় ভগবান, রাল্‌ফ হতভাগা আমায় কী বিপদের মধ্যেই না টেনে আনল। এখন উপায়? বরং পালিয়ে যাই—

আমার মুহূর্ত-ভাবনার মাঝখানেই চিচিং ফাঁক—দরজা খুলে সেই সুন্দরী রমণীর আবির্ভাব। এবং দরজার গোড়াতেই রাল্‌ফকে জড়িয়ে ধরে—

আমি চোখ বুঁজে ফেলি। সত্যিই তো, রাল্‌ফতো ঠিকই বলেছে। বেটা পাকা জহুরী।

ওদিকে রাল্‌ফ চেঁচাচ্ছে—ছাড় ছাড়, সঙ্গে গেস্ট আছে।

মেয়েটি হাত সরিয়ে থমকে দাঁড়াল। কটাক্ষ হেনে তাকাল আমার দিকে।

রাল্‌ফ আমাকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল মেয়েটির সামনে। তারপর বললে, আলাপ করিয়ে দিই,—আমার ইনডিয়ান ফ্রেন্‌ড, যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি। আর ইনি হলেন গিয়ে আমার এই ফ্ল্যাটের গৃহিণী লানা—লানা সোডা, আমার বউ।

আমি ধপ্‌ করে বসে পড়লুম। মাথা বন বন ঘুরছে।

সেই মেয়েটি থুড়ি, লানা হতভম্ব। আমাদের দুজনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল তাকায়। আমি অতি কষ্টে উঠে সোফায় বসে অস্ফুট স্বরে খাস মাতৃভাষায় বলি—হতভাগা! তোর মনে এত সব ছিল?

লানা রাল্‌ফের কাছে গিয়ে সবিস্ময়ে তখন প্রশ্ন করছে—ডারলিং কী ব্যাপার বলতো, তোমার গেস্ট কেন অমন করছেন, ফিটের ব্যারাম আছে নাকি?

বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন

নামকরা কমপোজার, ততধিক নামী বাজিয়ের দল; বেহালা-চেলোর ছড় সুরের সুরভি ছড়িয়ে ছড়িয়ে হঠাৎ উদ্দাম, শ্রোতার সারা দেহে রোমাঞ্চ। ঠিক এমন সময় সুর স্তব্ধ, বাজিয়েরা নিরুদ্দেশ। তার বদলে কোমর জড়িয়ে হালকা নাচের তালে দুই তরুণ-তরুণীর প্রবেশ। তাঁদের কণ্ঠে চটুল গান—'ইউ লাভ ডবলমিন্ট গাম, ডবল গুড ডবল গুড ডবলমিন্ট গাম।'

পলকে ভেসে উঠল আর একটি ছবি। লেখা "রীগলি'জ ডবল মিনট চুইং গাম।" মুহূর্তে ছবি উধাও, আবার সুরের মুর্চ্ছনা, আবার সেই অরকেসট্রা।

কিন্তু মাঝখানের ওইটুকু? বিজ্ঞাপন। অরকেসট্রা যদি আধঘণ্টা চলে, অন্তত আটবার সংগীতের রসভঙ্গ ঘটিয়ে রীগলি কোমপানি তাদের পণ্যের প্রচার করবেন। কেননা, টেলিভিশনে ওই বাজনা বাবদে কয়েক লক্ষ টাকা ওরা জোগান দিয়েছেন যে।

ঠিক এমনই অভিনয়ের মাঝখানে, সংবাদপাঠের সঙ্গে, গানের 'সঙ্গত' হিসাবে বিজ্ঞাপন অনিবার্য। শুধু টেলিভিশন নয়, খবরের কাগজ, পথঘাট দোকানপাট সর্বত্র ওই বিজ্ঞাপনমেব কেবলম।

মারকিন দেশে এলেই টের পাওয়া যায়—বিজ্ঞাপন কীভাবে বিরাট এক শিল্পে পরিণত হয়েছে। খবরের কাগজের সত্তর ভাগ জায়গা জুড়েই পণ্যের বাজার। যেহেতু বাজারটা ক্রেতার, তাই 'সেল সেল' চিৎকার পেড়ে বিক্রেতার দল কাগজের জায়গা দখল করে থাকেন। হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে, খবরের কাগজের ক্রেতাদের শতকরা ষাট ভাগই বিজ্ঞাপনের পাঠক।—'খবর? আরে সেতো টেলিভিশনেই আগে জেনে ফেলেছি, তার জন্যে

পয়সা খরচ করে কাগজ কিনতে যাব কেন? কিনি কোথায় কোন্ জিনিসটা সস্তায় যাচ্ছে দেখতে।'—এই ধরনের উক্তি আঁমেরিকার যত্রতত্র।

এবং ওদেশের খবরের কাগজ যতখানি পাঠ্য, তারচেয়ে বেশি দ্রষ্টব্য। বিশেষ করে রবিবারের। আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বোমবে তক্ এক কপি রবিবাসরীয় নিউ ইয়র্ক টাইমস অতি কষ্টে এনেছিলুম। অন্যান্য মালের সঙ্গে ওজনে পাল্লা দেওয়া ওই কপি শেষ পর্যন্ত প্লেন থেকে নামাতে পারলুম না ভারের চোটে। আর ওই ভারের শতকরা সত্তর পঁচাত্তর ভাগ, আগেই বলেছি, বিজ্ঞাপনের।

গড়পড়তা হিসাবে নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রতি রবিবার থাকে সাড়ে চারশ থেকে পাঁচ শ পাতা। এক রবিবারের নিউ ইয়র্ক টাইমসের পাতা গুনেছিলুম। মোট পৃষ্ঠা ৪৬৪। তার মধ্যে আবার দশটি ভাগ। যথা—ম্যাগাজিন ১৬০ পাতা, গ্রীস সম্পর্কে ক্রোড়পত্র —১৬, কমিকস ইত্যাদি—২০, পুস্তক সমালোচনা—৫০, ভ্রমণ—২৪, সংবাদ—৯৬, ছবি-নাটক-নাচ ইত্যাদি—২৮, খেলা—২৬, সাপ্তাহিক সংবাদ-সমীক্ষা—১৪ এবং অর্থনীতি—৩০। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবই আলাদা আলাদা ভাগ করা। যার যাতে রুচি, সেই ভাগটি তুলে নিয়ে বাকিটা ফেলে যাও। না, বাড়ি নিয়ে' লাভ নেই, কেননা, 'পুরনা কাগজ বিক্রি' বলে ওদেশে কেউ চেঁচায় না, ঠোঙাও কেউ বানায় না।

নিউ ইয়র্ক টাইমস একমেব নয়, কোন কাগজই তিন চার শ পাতার কম না। সাধারণ একটা ছোট শহরের কুড়ি হাজার কপি সারকুলেশনওয়ালা সংবাদপত্রও রবিবারে শ' দুয়েক পাতা নিয়ে বাজারে নামে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনেও খবরের কাগজের হকারদের গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে যেতে হয়। ছোট বড় প্রকারভেদে ওইসব দিনেও কাগজের পৃষ্ঠাসংখ্যা পঞ্চাশ থেকে দেড় শ। আর

কী টেলিভিশন, কী খবরের কাগজ, দুটোতেই আধিপত্য বিজ্ঞাপনদাতার। বিজ্ঞাপনের খাতিরের একটু আধটু খবর শুধু ছিটিয়ে দিতে হয়।

খবরের কাগজে, টেলিভিশনে এবং নিয়ন আলোতে যাঁরা বিজ্ঞাপন বাবদ সবচেয়ে বেশি খরচ করেন, তাঁদের মধ্যে উঁচু দরের আছেন সাতজন। এই সপ্তরথীর শীর্ষে 'প্রকটর অ্যানড গব্‌ল্' নামে স্ন্যপ, টুথপেসট ইত্যাদি জিনিসনির্মাতা একটি কোমপানি। তাঁদের বার্ষিক বরাদ্দ বছরে ২০০ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকা। তারপরেই জেনারেল মোটরস—১৬০ মিলিয়ন ডলার (৮০ কোটি টাকা), ফোরড কোমপানি—১০১ মিলিয়ন ডলার (৫৫ কোটি টাকা), জেনারেল ফুডস—১০১ মিলিয়ন ডলার (৫৫ কোটি টাকা) সীয়ারস (ডিপারটমেনটাল স্টোরস)—৮৮ মিলিয়ন ডলার (৪৪ কোটি টাকা)। পানীয় কোকাকোলাও কম যায় না, তারা খরচ করে বছরে ৪৬ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ২৩।২৪ কোটি টাকা।

বিজ্ঞাপনের হারের বেলায় অবশ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস বা লস এনজেলেস টাইমস নয়, সবাইকে টেক্কা মারে সচিত্র সাপ্তাহিক লাইফ। প্রতি সংখ্যা 'লাইফ' থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ আয় ৩৬০০৯৪৮ ডলার। প্রায় দু' কোটি টাকা। লাইফ কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া শ্লাঘার বিষয়। একবার ওই কাগজে ঠাঁই পেলে কোমপানি জাতে ওঠে। পরে অন্য কাগজে তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে লেখে—'লাইফ কাগজে বিজ্ঞাপিত অমুক জিনিস কিনুন।'

বিজ্ঞাপনে আমেরিকার সর্বোচ্চ রেট ধরা আছে লাইফের ব্যাক কভারে। সেখানে একটিবার একটি বিজ্ঞাপন দিতে গেলে খরচ করতে হবে, বেশি নয়, মাত্র ৬৬৪০০ ডলার। অর্থাৎ অতি সামান্য ৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। ভিতরের আধখানা পাতায় সাদাকালোর বিজ্ঞাপনের রেট ১৮৩১৫ ডলার। অর্থাৎ লাখ টাকার কাছাকাছি।

টেলিভিশনে এক একটা কোমপানি দিনের কিছু সময় 'বুক' করে রাখে। নাচ গান অভিনয় বা সংবাদ যাই হোক না কেন, পরিবেশন হয় কোন কোমপানির সৌজন্যে। তারাই খরচ দেয়। বদলে নেয় অল্প কয়েক মিনিটের বিজ্ঞাপন। বছর চার আগে ৯০ মিনিটের একটি টেলিভিশন প্রোগরামে একটি কোমপানি খরচ করে ৩০ লক্ষ টাকা। জেনারেল মোটরস এক ঘণ্টার একটি প্রোগরামে নিজেদের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল মাত্র পাঁচ মিনিট। এন বি সি টেলিভিশনে প্রতি ঘণ্টায় বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে আসে ১৫০৬৮০ ডলার। প্রায় আট লাখ টাকা।

বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে সিগারেট কোমপানিগুলিও কম যায় না। দামে যদিও আমাদের দেশের চেয়ে ওদেশের সিগারেট সস্তা, তবু এক একটি সিগারেট কোমপানি কারটন-পিছু বিজ্ঞাপনে খরচ করে দেদার। নতুন সিগারেট হলে তো কথাই নেই, খরচের হার বেড়ে যায়। যেমন ধরুন লার্ক সিগারেট। নতুন বলে ওদের কারটন পিছু বিজ্ঞাপন খরচ ৪৮.৭ সেণ্ট। অর্থাৎ প্রায় পাঁচ টাকা। বাজারে চালু 'ক্যামেল' এবং 'পলমল'-এর খরচ প্রতি কারটনে যথাক্রমে ২.৭ সেণ্ট ও ৩.৪ সেণ্ট। পলমল ১৯৬৪ সালে বিজ্ঞাপন বাবদে মোট খরচ করে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। ইদানীং আবার নিজেদের খরচেই সব সিগারেট কোমপানিকে প্যাকেটের গায়ে লিখে দিতে হচ্ছে 'শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, নিজ দায়িত্বে কিনুন।'

অর্থাৎ ১৭৬০ দৈনিক, ১০ হাজার সাপ্তাহিক, ১১ হাজার ম্যাগাজিন, ৫২৫৫টি রেডিও স্টেশন, ৫৯০টি টি-ভি স্টেশন এবং পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে অসংখ্য আলোয় বিজ্ঞাপনে খরচের যা বহর, তাতে আমাদের দেশের পাঁচসালা যোজনার অনেক কাজ অনায়াসে হয়ে যায়। আর হবেই বা না কেন, মারকিন মুলুকে ভোগ্যপণ্যের খুচরা বিক্রি আড়াই হাজার বিলিয়ন ডলার—১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা।

বিজ্ঞাপন না দিয়ে উপায়ও নেই। উৎপাদন এত বেশি, তাকে ভর দেবার জন্যে শ্লোগানে শ্লোগানে গোটা দেশ ভাসিয়ে দিতেই হবে। গড়পড়তা হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে, তিনজনের পরিবার পিছু বছরে খরচ হয় ৭১৪০ ডলার (মাসে তিন হাজার টাকা)। তারমধ্যে খাবার ধূমপানে শতকরা ২৫%, গৃহস্থালিতে ১৪%, বাড়ি ভাড়ায় ১৩.১%, যাতায়াতে ১২.৪%, জামাকাপড়ে ১০%, চিকিৎসায় ৬.৭%, মদ্যপান ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৬.২%, বিনোদনে ৬.১% এবং দানখয়রাত, ধর্মীয় ব্যাপারে ২%। সুতরাং মোটরগাড়ি জামাকাপড় মদ-সিগারেট, রেফরিজারেটর-হীটার ইত্যাদি কেনবার জন্যে প্রস্তুতকারকদের ছুড়োছুড়ি তো লেগে যাবেই। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে গোটা আমেরিকাকে বিজ্ঞাপনের নামাবলী গায়ে দিয়ে বসে থাকতেই হবে। বাইরে থেকে যাঁরা যাবেন, বিজ্ঞাপনের নানান রকম বাহারে চটকে কায়দাকানুনে তাদের চোখও ঝলসাবে।

এই বিজ্ঞাপন পড়া বা দেখার মত আনন্দের জিনিস ওদেশে আর নেই। পড়তে পড়তে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারও নজরে পড়ে। অনেকেই জানেন, বিদেশে টিপস দেওয়ার রেওয়াজ কী ভীষণ। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে টিপস-এর জ্বালাতন। দরজা খুলে দিলে টিপস, লাগালে টিপস, হাসলে টিপস, কাঁদলে টিপস।

ধারণা ছিল, শুধু আমাদের মত বিদেশীরাই বুঝি ওই পকেটঘাতী টিপস-এ অতিষ্ঠ হন। নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটি আজব বিজ্ঞাপন পড়ে সেই ভুল ভাঙল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ একদিন দেখি একটি কোমপানির প্রচার—'কিনুন কিনুন নো টিপস কয়েন। ডলারে আটটা, দু ডলারে বিশটা।'

আদ্যোপান্ত পড়ে দেখি চমৎকার ব্যবস্থা। মেনডেল কোহন কোমপানি হুবহু কোয়ারটার (সিকি ডলার অর্থাৎ ১ টাকা ২৫ পয়সা) সাইজের নকল মুদ্রা তৈরী করে বাজারে চালাও ছেড়েছেন।

দেখে বোঝবার উপায় নেই নকল। আসল টাকা গচ্চা না দিয়ে অনায়াসে টিপস-এর কাজে লাগানো যায়।

বখশিস নেবার সময় মুদ্রা যাচাই করে নেওয়া বেআদবী ব্যাপার। প্রাপক পরে বাড়ি ফিরে হিসাব মেলাতে বসে গালাগালি যত ইচ্ছে দিক, সেই মুহূর্তে তো সেলাম নিয়ে গটমট চলে আসা যায়। ওই নো-টিপ মুদ্রায় ছোট ছোট হরফে লেখা আছে—দিস কয়েন ইজ ইওর টিপ। গিভ নাথিং, গেট নাথিং। জিরো সেনটস। ইট ম্যাচেস একজ্যাকটলি দি ভালু অব ইওর সারভিস।'

এই মুদ্রার ভীষণ চল। আমেরিকায় গেলে খোঁজ নেবেন। ঠিকানা—৫৪৮ মান স্ট্রীট, ডিপারটমেন্ট এফ ১১৪। নিউ রকেলে, নিউ ইয়র্ক।

ছেলের জন্যে

সদ্য-আনা একটি খবর তৈরি করতে টাইপ রাইটার আর ইংরেজী ভাষা নিয়ে যখন ধস্তাধস্তি করছি, পরিত্রাতার মত হাজির হয়ে রন ফাংক বললে, 'অমিত, যাও আনা কাশফির বাড়িটা ঘুরে এস। এইমাত্র খবর এসেছে, ঘুমের বড়ি বেশি খেয়ে আনা অজ্ঞান, নির্ঘাৎ আত্মহত্যার চেষ্টা। ডেন যাচ্ছে, কোন অসুবিধা নেই।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজী। বললুম—'ভালই হল, এক নজরে পরখ করে আসব আনা সত্যি সত্যি ভারতীয় কি না।'

ফাংক হাসতে হাসতে জবাব দেয়—দ্যাট্স্ রাইট।

ফাংক সানটা মনিকার 'দি ইভনিং আউটলুক' কাগজের ম্যানেজিং এডিটর, আমার সমবয়সী। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি কিছুদিন ওই কাগজে কাজ করেছিলুম। পূর্ব, উত্তর ও মধ্য আমেরিকার বিস্তর জায়গা ঘুরে পশ্চিমে এসে ঠাঁই নিয়েছি। আছি হলিউডের ফিল্মস্টারে স্টারে গিজগিজ ছবির মত শহর সানটা মনিকায়। সানটা বৃহত্তর লস এনজেলেসেরই একটা অংশ।

যাই হোক আমি আর ডেন অর্থাৎ ওদের আদালতের রিপোর্টার ডেনিয়েল সেই মুহূর্তেই রওনা। আনা কাশফির বাড়ি আমাদের অফিস থেকে বেশি দূর নয়।

গিয়ে দেখি বাড়িতে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। সাজানো গোছানো বাংলো বাড়ির আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড। আনা অচৈতন্য পড়ে আছে মেঝেয়, আর তার সাত বছরের ছেলে দেবী পুলিশকে টেলিফোন করছে—'মামী ফেল আউট অব বেড, আই কান্ট ওয়েক হার। প্লীজ কাম, হেল্প মি।'

খুনখারাপি, দুর্ঘটনা-রাহাজানি ইত্যাদির খবর পেয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে যাওয়ার এবং ঝটপট কলম চালিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ কাগজে লেখার অভ্যাস আমার কলকাতাতে অনেক হয়েছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোনদিন পড়িনি। স্থান আমাদের স্বপ্নের জগৎ হলিউড, নায়িকা সেই স্বপ্নলোকেরই একজন অসামান্যা সুন্দরী এবং ঘটনাবলী নাটকীয়।

খানিক বাদে পুলিশ এল। ডেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল, কাগজে নোট নিল, হাসপাতাল থেকে গাড়ি এল, আনাকে বাড়ি থেকে সরানো হল, দেবীর বাবা মারলোন ব্রানডোকে খবর দেওয়া হল, মারলোন এসে ছেলেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। সিনেমার মনতাজের মত পর পর অনেকগুলি ঘটনা।

আমি চোখ রগড়ে চিমটি কেটে পরখ করে নিলুম স্বপ্ন দেখছি না তো। হঠাৎ যেন মনে হল, হয়ত হলিউডে চাক্ষুষ দর্শন নয়, আসলে কলকাতারই কোন সিনেমা হলে বসে আমরিকী সিনেমা দেখছি।

সিনেমাই বটে, মারলোন ব্রানডো আর আনা কাশফিকে নিয়ে হলিউড পাড়ায় আর সানটা মনিকার আদালতে যে সব নাটকীয় কাণ্ড-কারখানা বছরের পর বছর হয়ে গিয়েছে, তা কোন রগরগে উপন্যাস বা সিনেমার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর।

পরদিনের ঘটনা আরও নাটকীয়। আনা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে দেখে ছেলে নেই। পাগলের মত ছুটল ব্রানডোর বাড়িতে। ব্রানডো তখন স্টুডিওয় সুটিংয়ে। আনা ছেলেকে তুলে নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে।

এই ঘটনার পর ব্রানডো-কাশফি মামলা সানটা মনিকার আদালতে জমজমাট। ব্রানডো আনা কাশিফির বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ এনে আদালতকে বলল—আনা আমার বাড়ির

সব কিছু তচনচ করে এবং আমার সেকরেটারিকে ঘুসিতে ঘায়েল করে ছেলে নিয়ে পালিয়েছে।

সানটা মনিকার আদালত-রসিক ব্যক্তিদের প্যারাডাইস। ফিল্ম স্টারদের যত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা, তার প্রায় সব ওইখানে। এক একজন জজের ঘরে এক একটি নাটক। কোথায় কী চলছে জানতেও অসুবিধে হয় না। যদি কোন দিন ওই আদালত বাড়িতে যান, দেখবেন একপাল রিটায়ার্ড বুড়ো কোট-নেকটাইয়ে সেজেগুজে ঘুর ঘুর করছেন। কাজ-কর্ম নেই অবসর সময় কাটাতে ব্রেক ফাষ্ট সেরেই চলে আসেন রসের কথা শুনতে। আদালত বন্ধ হলেই দল বেঁধে বাড়ি ফেরেন। পরদিন ফের আদালতে। সব মামলার খবর ওঁদের নখদর্পণে। জিগগেস করলেই জানা যায় কোন্ ঘরে কোন্‌টি।—'অমুক মামলা, চলে যান অত নমবর ঘরে, জজ অমুক।'

আমি কয়েকদিন শুনেছি দুটো মামলা। মারলোন-কাশফি আর লুভট-জুডি'র। জুডি গারল্যানডের ব্যাপারটিও অনেকটা কাশফির মত। তাঁর স্বামী সিনেমা প্রযোজক সিডনি লফটের সঙ্গে আমার আলাপ ওই আদালতেই। চমৎকার অমায়িক ভদ্রলোক; ভারতবর্ষ সম্পর্কে খাঁটি খবর রাখেন। সাপ-বাঘ-মহারাজ-ভিক্ষুক-গরু নিয়ে যে-ভারত অধিকাংশ মারকিনীর কল্পনায়, লুফটের তা নেই। জুডি গারল্যাণ্ড সম্পর্কেও কথা হয় দেখলুম মেয়েটির প্রতি তাঁর মন তখনও মমতায় ভরা।

সে যাক, মারলোন আর কাশফির মামলা যেদিন ওঠার কথা, সানটা মনিকার আদালত লোকে লোকারণ্য। সবাই উন্মুখ মারলোনকে দেখার জন্যে। আমি আর ডেন অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে জায়গা নিই।

মারলোন ব্রানডোর সঙ্গে আনা কাশফির বিয়ে হয় ১৯৬৭ সালে। তাঁদের ছেলে ক্রীশচিয়ান দেবী ব্রানডো-র জন্ম বিয়ের সাত মাস পরে। সন্তান-জন্মের কিছু পরেই মনান্তর এবং ১৯৬০ সালে পাকাপাকি বিবাহ-বিচ্ছেদ। আনার অভিযোগ, স্বামী পরনারীতে আসক্ত, এমন কি যেদিন সে প্রসব বেদনায় কাতর, মারলোন তখন আর একজন অভিনেত্রী পিয়ের এনজেলিকে নিয়ে স্ফূর্তি করতে বেরিয়েছে।

আনা স্বামীকে হারিয়েছে, এখন ছেলেকে হারাতে রাজী নয়। ছেলের অধিকার নিয়েই তাই দুজনে লড়াই, দুজনে মামলা। আনা নিজেকে পরিচয় দেয় ভারতীয় বলে, ছেলের নামও তাই রেখেছে দেবী।

মারলোন সানটা মনিকার আদালতে, আগেই বলেছি, অভিযোগ করল, আনা তার বাড়িতে ঢুকে ছেলে নিয়ে পালিয়েছে। মারলোন ছেলেকে ফেরৎ চায়, কেননা অনেক আগে আদালত তাকেই ছেলের অধিকার দিয়েছে।

মারলোন আদালতের হুকুম নিয়ে গেল আনার বাড়িতে। গিয়ে দেখে আনা ছেলে নিয়ে পালিয়েছে। অনেক দিন পর ওদের খোঁজ পাওয়া গেল বেল-এয়ার স্যানড্স্ হোটেলে। মারলোন উকিল পেয়াদা গোয়েন্দা সব নিয়ে সেখানে হাজির এবং ছিনিয়ে আনল ছেলেকে।

আনার কী চীৎকার, কী পাগলামি! চড় মেরেই বসল মারলোনকে। পুলিশ গ্রেপ্তার করল আনাকে।

অতঃপর মামলা শুরু। মারলোনের আসার কথা, সবাই অপেক্ষা করছি। এল না, তার পক্ষে হাজির হলেন উকিল।

আনা কিন্তু এল। জজ রায় দিলেন, ছেলে মারলোন পাবে।

রায় শুনে আনার কী কান্না, কী কান্না। ছুটে বেরিয়ে এল আদালত ঘর থেকে। বারান্দায় লিফটের দিকে দৌড়চ্ছে

দৌড়তে চিৎকার করছে—আই ওয়াণ্ট মাই বেবি, আই ওয়াণ্ট মাই বেবি—

আহা বেচারা।

অফিসে ফিরে এলুম। রন জিগগেস করল, আনা-র সঙ্গে দেখা হল? ওকে জানিয়ে ছিলে তুমিও ভারতীয়?

রনকে বললাম, ভুলে গেছি।

নিজের টেবিলে এসে আবার টাইপ রাইটার নিয়ে বসলুম। কিছুই লেখা হল না, আমার কানে তখনও বাজছে আনার করুণ কণ্ঠস্বর—আই ওয়াণ্ট্ মাই বেবি, আই ওয়াণ্ট মাই বেবি—

ন্যাট কিং কোল

লস এঞ্জেলেসে থাকতে অসুস্থ দেখে এসেছিলুম, দেশে ফিরে কাগজে পড়লুম ন্যাট কিং কোল মারা গেছেন। বিলিতি গান-বাজনা ভাল বুঝিনে, কিন্তু যাঁদের যাঁদের গলা আমার ভাল লাগে, কোল তাঁদের একজন।

খবরটা পড়ে খারাপ লাগল। আরও খারাপ লাগল এই কারণে যে, মৃত্যুর অল্পদিন আগে কোল-এর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আমি যখন লস এঞ্জেলেসের লাগোয়া সানটা মণিকার ইভনিং আউটলুক কাগজে কাজ করি। কখনও কালিফোর্নিয়ার নতুন সেনেটর মার্ফির প্রেস কনফারেন্স 'কভার' করতে যাই, কখনও যাই আদালতে মার্লোন ব্রাণ্ডো আর আনা কাশফির মামলা দেখতে। হঠাৎ একদিন কাগজের ম্যানেজিং অডিটর রন ফাংক বললে,—অমিত, আমাদের ফটোগ্রাফারের সঙ্গে হাসপাতালে যাবে নাকি? তোমার ফেবারিট ন্যাট কিং কোল চিকিৎসা করাতে এসেছে।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজী। আগের দিন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের স্টুডিওয় আমার আর একজন ফেবারিট প্যাট বুন-এর সঙ্গে আলাপ করে এসেছি, ভালই হল, কোল্-এর সঙ্গে এবার দেখা হয়ে যাবে।

তারিখটা মনে আছে—১৯৬৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সেণ্ট জন হাসপাতালের সামনে খানিক অপেক্ষা করবার পর কোল্ বেরিয়ে এলেন। শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ। পাশে হাতে হাত জড়ানো স্ত্রী মারিয়া।

ছবি তোলা মুহূর্তে শেষ করে ইভনিং আউটলুকের ফটোগ্রাফার

আলাপ করিয়ে দিলেন—"চডুরী, ফ্রম ইণ্ডিয়া।" আমি বললুম—"রীয়্যাল ইণ্ডিয়ান।"

কোল মৃত্ব হাসলেন। বললেন—"ওদিকে আমার যাওয়া হয় নি।"

"তা না যান—আমাদের দেশে আপনার অনেক ভক্ত আছে"—আমি নিবেদন করলুম।

"তাই নাকি ?"—

কোল-এর কথা শেষ হল না। স্ত্রী মারিয়া তাঁকে টেনে নিয়ে গাড়িতে তুললেন। আর দেরি করা চলে না, চারদিকে ভিড় জমে যাচ্ছে। ন্যাট কিং কোলের গুণগ্রাহী সর্বত্র এবং বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাঁর পেছন পেছন ধাওয়া করে। অসুস্থ স্বামীকে এই ধকল সইতে দিতে মারিয়া নারাজ।

মারিয়ার ভয় পাবার কারণ সত্যিই আছে। কোল জনপ্রিয় গায়ক। ছেলেমেয়েরা তাঁর নামে পাগল। এবং মার্কিন দেশে এই পাগলামি কদ্দূর যায়, সে অভিজ্ঞতা তাঁদের দুজনেরই আছে।

এই পাগলামি অবশ্য অকারণ নয়। ন্যাট কিং কোল গত ক'বছর খ্যাতির শীর্ষে। ইদানীং টেলিভিশন, নাইট ক্লাব, থিয়েটার আর রেকর্ড থেকে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল কুড়ি লাখ টাকা। শো-বিজনেসে বেশী টাকা পাওয়ার রেকর্ডও তাঁর। লাস ভেগাসের এক হোটেল তাঁকে এক বছর পঁচিশ লাখ টাকা দিয়েছিল।

কোল-এর আদত বাড়ি আলাবামার। জন্ম ১৯১৯ সালের ১৭ মার্চ। কোল-এর বয়স যখন পাঁচ, তাঁদের পরিবারে সবাই চলে আসেন শিকাগো। গানবাজনার দিকে তাঁর ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই। ইস্কুলে পড়তেই তিনি নিজের একটি দেড় ডলারের ব্যাণ্ড তৈরী করেন।

তাঁর পুরো নাম নাথানিয়েল অ্যাডামস কোলস্। কিং কোল ট্রায়ো' যখন পরে তৈরী হয়, তখনই পদবীর কোলস্ থেকে 'এস' অক্ষর তিনি বাদ দেন। একবার নাইট ক্লাবের এক ম্যানেজার তাঁকে চারজনের একটি দল তৈরী করতে বলেন। তিনি ভাড়া করলেন তিন গাইয়ে বাজিয়েকে এবং নিজে বসলেন পিয়ানোয়। একদিন দলের ঢাকী গরহাজির। সেদিন থেকে তিনি ওকে বাদ দিয়ে দলের নাম দিলেন 'কিং কোল ট্রায়ো।' কিং কেন? কারণ ওই নাইট ক্লাবেরই ম্যানেজার একদিন তাঁর মাথায় সোনালী কাগজের মুকুট পরিয়ে দিয়ে গানের রাজা বলে তাঁর পরিচয় শ্রোতাদের দেন। তারপর থেকেই নাথানিয়েল ম্যাডামস কোলস হলেন ন্যাট কিং কোল।

কোল গোড়ার দিকে ছিলেন পুরোপুরি জাজ-শিল্পী, ছিলেন আর্ল হাইনজ আর লুই আর্মস্ট্রংয়ের ধারাবাহী। নিউ ইয়র্ক টাইমস একবার তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"Cole has seen fit to make his transition complete so that in place of a pianist who also sings, he has become a singer who occasionally plays the piano."

কোল-এর শরীর অনেকদিন থেকেই খারাপ যাচ্ছিল। ১৯৫৩ সালে একবার কার্নেগী হলের জাজের আসরেই পাকস্থলীর ঘায়ের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তারপর থেকেই একটা না একটা অসুখ।

গলায় ক্যান্সারের কথা অনেকদিন জানা যায় নি। কোল্ অসুস্থ—এই কথাই মুখে মুখে ঘুরছিল গত ডিসেম্বর থেকে। সানটা মণিকার সেন্ট জন হাসপাতালে কোল কোবাল্ট থেরাপি বিভাগে চিকিৎসা করতে গিয়েছেন, এই খবর বেরোনোমাত্র গোটা মার্কিন দেশে হই-চই। নানা গবেষণা—ক্যান্সার হয়েছে কি হয়নি।

এদিকে বেচারা মারিয়ার অবস্থা কাহিল। গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে দিনে গড়ে সাত হাজার করে চিঠি। সেই চিঠি বাছাই করার জন্যে কোলকে রাখতে হল আলাদা একজন সেক্রেটারি।

পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ডাক্তারদের স্থির সিদ্ধান্ত বিষণ্ণ মার্কিন জনসাধারণ শুনল কিছুদিনের মধ্যে। হ্যাঁ, কোল-এর দুরারোগ্য ক্যানসারই হয়েছে।

তারপর ছ-মাসও পেরোয়নি। দেশে ফিরেই শুনলুম কোল-এর কণ্ঠ চিরকালের মত স্তব্ধ।

ডলার মুলুকের গরিব

মারকিন মুলুক থেকে ফেরার পর সবাই আমাকে প্রশ্ন করেন ওদেশের ধনদৌলতের কথা। কিন্তু ওসব কী আর বলব, দেখে আমার চোখ টাটিয়েছে, বন্ধুবান্ধবদের খামোকা আর কষ্ট দিই কেন। বছরে পনের হাজার টাকার কম পেলেই যে-দেশে গরিব বলা হয় সে দেশের লোকজন কেমন আরামে দিন কাটায় সে কথা ঘটা করে বলার কী দরকার। বিশেষ করে যখন আমাদের দেশে তর্ক চলে একজন লোকের রোজকার গড় আয় উনিশ পয়সা, না তার বেশী।

তবে হ্যাঁ, আমাদের দেশে যেমন বেশ কিছু কেষ্টবিষ্টু আছেন যাঁদের ধনদৌলতের প্রচারে বিদেশে আমাদের মত ছাপোষা মধ্যবিত্তকেও লোকে 'মহারাজা' ভাবে, ঠিক তেমনই বিলাস আর আরামে মোড়া মারকিন দেশেও আমাদের মত হাজার হাজার গরিব রয়েছে।

অবিশ্বাস্য, অথচ সেই একই বৃত্তান্ত—হাড় জিরজিরে চেহারা, খেতে পায় না পুরো পেট, থাকে ভাঙা বাড়িতে, পরে ছেঁড়া জামা এবং অবসর পেলেই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়।

এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয় আমার মার্কিন দেশ সফরে। ঐশ্বর্য আর বিলাসের ছড়াছড়ি সর্বত্র। হাসি গান আর আলোয় চারদিকে সম্বৎসর, অষ্টপ্রহর পূর্ণিমা। কিন্তু এই 'পূন্নিমেতেও অন্ধকার' কয়েকটি জায়গায়—যাদের কথা অন্য রাজ্যের অনেক মার্কিনীও জানেন না, জানেন শুধু জনসন-সরকার। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে ১৯৬৫ সালে তিনি ৬২—২২ ভোটে 'আপালাচিয়া বিল' পাস করিয়েছেন সেনেটে।

এই বিল কেন, এই গরিব কারা ? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে চোখ ফেরাতে হয় কেনটাকি রাজ্যের পূর্বে আপালাচিয়ান পর্বতমালার সানুদেশে। সেখানে বাস করে কয়েক লাখ লোক। 'কালা আদমি' কেউ নয়, সবাই সাদা চামড়ার। এইখানেই আছে রক্সনান গ্রাম। এই গ্রাম আর গ্রামের লোকের চেহারা, কোট-প্যান্ট-রঙ বাদ দিলে, অনেকটা বাংলা বা বিহারের যে-কোন গ্রামের মত। সেখানে লোকের মাসিক গড় আয় ছয় ডলার অর্থাৎ তিরিশ টাকারও কম। সেখানে ছেঁড়া গাউন পরে মেয়েরা, বালতি হাতে কুয়োতলায় জল আনতে যায়। সারা গাঁয়ে হয়ত ওই একটির বেশী কুয়ো নেই। সেখানে ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় যায় ছেঁড়া বই নিয়ে, বসে ভাঙা বেঞ্চিতে। ঘরদোরের চেহারাও তথৈবচ। আর দু'বেলা ভরপেট রুটি-গোস্ত জোটে খুব কম লোকের।

ভিখারি আছে নিউ ইয়র্ক শিকাগোর রাস্তায়, দক্ষিণে আছে ভুখে মরা নিগ্রো, কিন্তু উত্তরে, ঐশ্বর্যের মাঝখানে সাদা চামড়ার লোকের মধ্যে দারিদ্র্যের চেহারা এত ভয়ানক কেন ?

কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন টেলিভিশনে এদের নিয়ে একটি চমৎকার অনুষ্ঠান করেছিলেন। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'আপালাচিয়ায় বড়দিন।'—এক হোটেল-ঘরে বসে অনুষ্ঠান দেখছিলুম। দেখছিলুম মার্কিন দেশে দারিদ্র্যের বীভৎস রূপ। সংবাদদাতা রক্সনানের এক ঘরণীকে জিগগেস করেছিলেন, তাঁর কাছে বড়দিনের কোন অর্থ আছে কি না। যে-দেশে বড়দিনের হুল্লোড়ের বান ডাকে, সেই দেশেরই ওই ঘরণী জবাব দিয়েছিলেন, 'না কোন অর্থ নেই, গরিবের ঘরে বড়দিন না এলেই পারে।'

এই কথা আমার অনেকবার শোনা। প্রতি বছর পুজোর সময় বাংলাদেশে সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। টেলিভিশন দেখতে দেখতে ভ্রম হচ্ছিল, মার্কিন দেশে, না ভারতবর্ষে আছি ?

এই প্রশ্নের উত্তর অনেক মার্কিনীর কাছে জানতে চেয়েছিলুম।

বলেছিলুম, সারা দেশে খাবার আর চাকরির ছড়াছড়ি, বহু রাষ্ট্রের ক্ষুধা মেটাতে তোমাদের দেশ থেকে টাকা অঢেল যায়, 'আর এরা, রূপকথার জগতের লোকরা পেটের জ্বালায় মরে কেন ?

ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-তত্ত্ব বিভাগের একজন গবেষকের মতে পিতৃপিতামহের জমির প্রতি টান তার অন্যতম কারণ। কাছের শহরেই আছে চাকরি, আছে অন্নবস্ত্রের সংস্থান, তবু এরা যাবে না, বাস্তুভিটা ছেড়ে। এখানকার পরিবেশ আলাদা, এখানকার ধরনধারণ আলাদা। জমি থেকে ভাল ফসল আসে না, তবু হাজার হাজার লোক ওই পাহাড়ী এলাকার অন্ধকার জগতে বাস করে। ছোট থেকেই মা-বাবা সন্তানকে কানমন্ত্র দেয়—'এই জমি ছেড়ে চলে যাস নে।'—এই মন্ত্র পরে রক্তে মিশে যায়।

সমাজতাত্ত্বিকের এই মন্তব্য কতদূর সত্যি ঠিক জানি নে, কিন্তু জাজের কড়া বাজনা আর টুইস্টের চড়া নাচে মশগুল আমেরিকায় এমন জিনিস দেখতে হবে কে ভেবেছিল ?

বিলিতি বিনোদিনী

একুশ বছর আগে মিডিলসেক্সের এক শহরতলীতে যে মেয়েটির জন্ম, যার শৈশব আর কৈশোর কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে, কয়েক বছর আগেও সেই মেয়ে কি ভেবেছিল, তার নাম এইভাবে ফিরবে সারা দুনিয়ার মুখে মুখে, এইভাবে সে রহস্য-উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর এক প্রণয়োপাখ্যানের নায়িকা হবে ?

হ্যাঁ, উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল, ছিল রস-তরিৎ-সাগরে ডুব দেওয়ার প্রলোভন, ফেনিলোচ্ছল যৌবন-সুরা আকণ্ঠ পান করার দুর্নিবার আকর্ষণ ; কিন্তু একবিংশতি বসন্তের ডালি নিয়ে প্রস্তুত এই বিনোদিনী বিমোহিনী কি সেদিনও জানতে পেরেছিল নাটকীয় ক্ষিপ্রতায় পরিণামের বিস্ফোরণ এত দ্রুত, এত প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়বে ?

তারপর সে বিশেষণে সবিশেষ। সে মায়াবিনী, সে 'সংহারিণী'। বাপ মা'র দেওয়া নাম ক্রিস্টিন কীলারের আগে এমনি অসংখ্য সম্বোধন জুড়েও সাংবাদিকদের তৃপ্তি হয় না। তার সঙ্গ-সুখের অপরাধে বহু রথীমহারথী আজ বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। বৃটেনের প্রাক্তন সমর-সচিব জন প্রফুমো পদচ্যুত, অস্থিবিদ্যা বিশারদ চারুশিল্পী ডাঃ স্টিফেন ওয়ার্ড পুলিশের হেফাজতে এবং সর্বোপরি ম্যাকমিলান-মন্ত্রিসভা টলমল।

বৃটিশ পত্র-পত্রিকাও ছিল কীলার-সর্বস্ব। পাতার পর পাতা জুড়ে অজস্র কাহিনী, অজস্র উপাখ্যান। লর্ড অ্যাস্টরের পল্লীকুঞ্জে অভিজাত কুলতিলকদের তিমিরাভিসার, প্রিয়সুখভাগিনী বিবসনার জলকেলি, যৌবনবেদনারসে উচ্ছল অজস্র তিলোত্তমা-মুহূর্ত অতীতের সকল প্রণয়োপাখ্যান, আরব্য-উপন্যাসের সকল রজনীকে ম্লান করে দিয়েছে।

সতের বছর বয়সে জাত কাণীন সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে ক্রিস্টিন কীলার যখন প্রমোদ তরণীতে ভাসতে ভাসতে লণ্ডন শহরে এল, তখন ১৯৫৯ সাল। তাপরেই শুরু হল সমাজের চূড়ামণিদের সখী হয়ে বিলাস-বৈভবে দিন যাপনের লগ্ন। এল অস্থিবিদ্যাবিশারদ ডাঃ ওয়ার্ডের আনুকূল্যলাভের অবিস্মরণীয় তিথি।

তবু সে সময়ের ঘটনাবলী অসংখ্যের অন্যতম, সমগ্রের তুলনায় সাধারণ। অসাধারণ হল সেইদিনই, যেদিন কীলারের কটাক্ষে বিমুগ্ধ হলেন বৃটিশ সমর-সচিব জন প্রফুমো এবং লণ্ডনের রুশ দূতাবাসের নৌ-প্রতিনিধি আইভানভ যুগপৎ।

কিন্তু প্রফুমোর সঙ্গে কীলারের প্রথম সাক্ষাৎ কবে? প্রথম দেখার সেই মধু-লগনে কার মনের প্রলাপ সেদিন বাতাসে জড়ানো ছিল? যদি জড়িয়েই থাকে তবে কোথায়?—বলা বাহুল্য বাকিংহামশায়ারে লর্ড অ্যাস্টরের পল্লীকুঞ্জ ক্লাইভডন হাউসে।

প্রফুমো-কীলার মিলনের প্রথম ক্ষণ ১৯৬১ সালের জুলাই। সুইমিং-পুলের নীল-যমুনায় কেলিক্লান্ত কীলার যখন বিবসনা দেহ নিয়ে হঠাৎ উঠে পড়েছিল, সদ্যোস্নাতা সেই 'মৎস্য কন্যার' সামনে তখন দাঁড়িয়ে সুপুরুষ জন প্রফুমো। গায়ে ডিনার-জ্যাকেট, ঠোঁটে হাসি, চোখে জাদু। খোদাই করা মর্মর মূর্তির ভঙ্গীতে দাঁড়ানো কীলারের শরীর বেয়ে তখন জল ঝরছে অঝোরে, পাখামেলা লাল চুল আরও বেপরোয়া। প্রফুমোর বক্ষোভেদী কৌতূহলী দৃষ্টির আলিঙ্গনে অঙ্গ তার বেপথু, বুঝিবা রোমাঞ্চিত।

সেদিন লর্ড অ্যাস্টরের বাড়িতে ছিল ডিনার পার্টি। প্রফুমো অন্যতম আমন্ত্রিত। ডাঃ ওয়ার্ড তো ছিলেনই, কীলার ছিল লণ্ডনে এক ক্লাবে। সেখান থেকে গরমে নেয়ে শরীর জুড়াতে ছুটে এলো ক্লাইভডন হাউসে। আর একজন বান্ধবীকে নিয়ে যখন পৌঁছলো তখন মধ্যরাত্রি।

আকাশে চাঁদ, বাতাসে মাদকতা।

সুইমিং পুল দেখবামাত্র কীলারের মন উদ্বেল হয়ে উঠল। সে ঝাঁপ দিতে এগোল। বন্ধু ওয়ার্ড বললেন, "কীলার, আজ তোমায় নিরাবরণ সাঁতার দিতে হবে।"

সে এক কথায় রাজী। ডাঃ ওয়ার্ড সুইমিং কস্টিউম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পাড়ে। কীলার জলে ডুব দিল। চাঁদের প্রতিবিম্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

সাঁতার সেরে পারে উঠতেই সেই 'অঘটন'। সামনে ডিনার জ্যাকেট পরা মূর্তিমান সুপুরুষ জন্ প্রফুমো। সঙ্গে লর্ড অ্যাস্টর। প্রফুমো কে, সে তখনও জানে না, জানে শুধু তার নিজের দেহে 'বার্থ-ডে স্যুট', এক চিলতে কাপড়ও নেই।

এই সময় আর এক কাণ্ড, ডাঃ ওয়ার্ড উচ্ছ্বসিত হাসিতে আকাশ ফাটিয়ে এক রসিকতা করে বসলেন। কীলার তার এক পরিচিতকে এই ব্যাপার পরে বলেছে—"আমি যখন নিজের দেহ নিয়ে বিব্রত, স্টীফেন ওয়ার্ড দুষ্টুমির চূড়ান্ত করে দূরে ছুঁড়ে দিলে তার হাতে রাখা আমার সেই সুইমিং কস্টিউমস্। এতোগুলো দৃষ্টিবাণের ব্যূহে পড়ে আমি তখন কী করি? হঠাৎ দেখি দূরে একখানা তোয়ালে। ছুটে গেলাম, তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিলুম।"

নগ্নতা নিয়ে অবশ্য কীলারের মনে কোন দুর্বলতা নেই। জলে যদি নামতেই হয়, সাঁতার যদি কাটতেই হয়, তাহলে বিবসনা হতেই হবে। তাঁর ভাষায়—"আমার জন্মমুহূর্তে যে-রকম নগ্ন ছিলাম, ঠিক সেইরকমভাবে সাঁতার কাটতে না পারলে সুখ কোথায়? জলকেলিতে নামলে আমি যে পাগল হয়ে যাই।"

মুহূর্তে সে তার সৌন্দর্যের শত্রু লজ্জাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এগিয়ে গেল প্রফুমোর অতি সন্নিকটে। লর্ড অ্যাস্টর পরিচয় করিয়ে দিলেন। কীলার সেই মুহূর্তের কথা স্মরণে নিজেই বলেছে—"মনে আছে বিল অ্যাস্টর আমাদের পরিচয়-বিনিময় করান। জলে ঢলঢল শরীরটাকে নিয়ে আমি প্রথমটা তখন ব্যতিব্যস্ত। একমেব সেই

ছোট তোয়ালেটা দিয়ে অবাধ্য যৌবনকে আটকাতে চাই, পারি না। এদিকে টানি তো ওদিকে বেরিয়ে যায়, মহা সমস্যা।"

বিপর্যয়ের শেষ এখানেই নয়। খানিক বাদে আরও কণ্ঠস্বর, আরও কলোচ্ছ্বাস। বাকি আমন্ত্রিতরা হাসির তুফান ছুটিয়ে সদলবলে উপস্থিত। এই দলে আছেন অ্যাস্টর-জায়া ব্রনওয়েনপাগ এবং 'জ্যাকের' স্ত্রী ভালেরি।

পুরুষ-পাগল কীলারের রজতশুভ্র দেহ তখন সকলের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। অতিক্ষুদ্র সেই তোয়ালে তাকে করে তুলেছে আরও রহস্যময়। তার চোখের মোহিনী মায়া ছড়িয়ে গেছে প্রতি শিরা-উপশিরায়, প্রতিটি প্রত্যঙ্গে। জ্যোৎস্নামদির অ্যাস্টরকুঞ্জ তৎক্ষণাৎ খুলে দিল অনন্ত সুধার ভাণ্ডার। চারদিকে আলো, হাসি, গান, সুবেশা-সুবেশীর ভিড় এবং তারই মাঝখানে নির্মেঘ ওই খোলা আকাশটার মত একমাত্র সে বিবসনা, 'দেহ দীপাধারে জ্বলিত লেলিহ' ভেনাস-সুন্দরী।

পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিতে এইভাবে ধরা দেওয়া কীলারের জীবনে নতুন কিছু নয়, তবু আজ যেন সে একটু বিস্রস্ত। সঙ্গসুখভিলাষী পুরুষের কাছে যত না অস্বস্তি, তার চেয়ে বেশী অস্বস্তি এই অভিজাত মহিলাদের হঠাৎ-উপস্থিতিতে।

ভালেরি কটমট করে তাকালেন। তিনি যেন বলতে চাইছেন —'কেমনতর মেয়ে গো তুমি, সুইমিং কস্টিউম একফালিও কি তোমার জোটে না?"

বললেনও ঠিক তাই। তার জবাবে কীলার ডাঃ ওয়ার্ডের সেই রসিকতার কথা ভাঙতে পারল না। শুধু মাথা নাড়ল, চুলের রাশ এলিয়ে দিল।

প্রফুমো-পত্নী ভালেরির হাতে ছিল আর একখানা সুইমিং কস্টিউম। তিনি তা ছুঁড়ে দিলেন। অসম্বৃতা কীলার লুফে নিয়ে গায়ে জড়াল। তোয়ালে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

প্রফুমো তখন কী করছিলেন ? কীলার টের পেয়ে গেছে, তাঁর দৃষ্টি তখনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ় নিবদ্ধ। কীলার নিজেই বলেছে, "এই দৃষ্টির মধ্যে আমি কামনার সন্ধান পেয়েছি। বুঝতে অসুবিধে হয়নি প্রফুমো আমার প্রতি আকৃষ্ট।"

আর সে নিজে ? হ্যাঁ, সেও একই পথের পথিক। এবং কীলারের বলতে লজ্জা নেই, সেই প্রথম দেখার রাত্রেই তারা দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল।

জামাকাপড় পরে কীলার ফিটফাট। প্রফুমো তাকে নিয়ে গেলেন অ্যাস্টরভবনে, অন্দর মহলে। চারিদিকে বিলাসব্যসনের ছড়াছড়ি, ঐশ্বর্যের সমারোহ। প্রফুমো-কীলার আপনমনে এঘর ওঘর ছুটে বেড়ান, হাতে হাত ধরেন, হাসি ছুঁড়ে দেন।

দূরে বাগানে নৈশভোজের আসর। সেখানে অন্য অতিথির ভিড়। প্রফুমোর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সদ্যোস্নাতা কীলার তাঁর ভুবনমোহিনী রূপ দিয়ে তাঁকে এখানে বেঁধে রেখেছে।

রাত বাড়ে, বাড়ে ঘনিষ্ঠতা। নিভৃত এক কক্ষে এসে প্রফুমো হঠাৎ জড়িয়ে ধরেন কীলারকে। টেনে আনেন ঘন সান্নিধ্যে। কীলার আশ্চর্য হয় না। সে ভেবেই রেখেছিল, একখুনি এইরকম একটা কিছু হবেই হবে। আর তাছাড়া এমন একজন অভিজাতের স্পর্শসুখ!

খানিকবাদেই খাওয়াদাওয়া, হাসি ঠাট্টা তামাসা। রাত যখন দুটো, এল বিদায়ের পালা। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, সবাই একে একে ঘরমুখো।

প্রফুমো যাবার আগে আবার এলেন কীলারের সামনে। কিছুই বললেন না। শুধু চেয়ে রইলেন নির্নিমেষ। যা বলবার, তাতেই সব বলা হয়ে গেল।'

তারপর বিদায়। তির্যক দৃষ্টি হেনে ভালেরি হবসন প্রফুমোর পাশে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। গাড়ি নিমিষে মিলিয়ে গেল।

স্টীফেন ওয়ার্ড আর কীলার উঠলেন আর একখানা গাড়িতে। দুজনে একসঙ্গে ফিরে এলেন লণ্ডনের ফ্ল্যাট। যাবার আগে পরদিনের পার্টিতে থাকার প্রতিশ্রুতিও লর্ড অ্যাস্টরকে দিলেন সানন্দে।

লণ্ডনে ফিরে আবার সেই গতানুগতিক জীবন। কীলার সকাল থেকে ছটফট করে অ্যাস্টার-কুটিরের রাত কখন আসবে। হাইড পার্ক, কেনসিংটন গার্ডেন, টেমস, ট্রাফালগার স্কোয়ার, সব মিথ্যে। ঘুরেফিরে একটি নাম, একটি কুঞ্জের কথাই বারবার মনে দোলা দেয়।

পশ্চিমে সূর্য ঢলতেই কীলার সেজেগুজে তৈরী। অ্যাস্টরের পল্লীকুঞ্জপথে আবার সে অভিসারিণী কামিনী।

স্টীফেন ওয়ার্ডের গাড়িতে চড়লেন তাঁর কিছু ইয়ারদোস্ত। কীলারের গাড়ির চালক অন্য একজন। জাতে রুশী, নাম ইউজিন আইভানোভ। কীলার তাঁকে অনেকদিন থেকেই চেনে। আইভানোভ স্টীফেনের বন্ধু হিসেবে ইতিমধ্যেই কয়েকবার এসেছেন তাঁদের দুজনের ফ্ল্যাটে—উইমপোলমিউজে।

ক্লাইভডেন হাউসে পৌঁছামাত্র কীলার খুলে ফেললে বসনভূষণ। নিরাবরণ ঝাঁপিয়ে পড়লে সেই স্যুইমিং পুলে। এখানে এলেই যে সে শুনতে পায় অতল জলের আহ্বান!

পারে দাঁড়িয়ে আইভানোভ। দাঁড়িয়ে স্টিফেন ওয়ার্ড। তাদের মনও চঞ্চল। তাঁরাও জলের ডাক শুনতে পেয়েছেন।—'মন রয়না রয়না ঘরে, চঞ্চল প্রাণ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি হাঁকিয়ে হাজির জন প্রফুমো। গত রজনীর মধুস্মৃতিতে তখনও তাঁর দেহমন আচ্ছন্ন।

প্রফুমো এসে দাঁড়ালেন বিবসনা সুন্দরীর জলকেলিতে মুগ্ধ দুই বান্ধবের মাঝখানে। ওয়ার্ড পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রফুমো ও আইভানোভকে। এবং সেদিনই তাঁদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎকার।

শেষ সূর্যের আলোয় ক্লাইভডেন হাউসের কুঞ্জবীথিতে, স্যুইমিং পুলের কাকচক্ষু জলে তখন বিদায়-রক্তিমা। শ্বেতবরণী কীলারের রক্তকেশ তলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল সেই লাল জলে। কীলার দুরন্ত গতিতে সাঁতার কাটে, ডুব দেয়, এ-কূলের কাছে এসে আবার ফিরে যায় ও-কূলের অতলে।

প্রফুমো, আইভানোভ, ওয়ার্ড—কেউই আর স্থির থাকতে পারলেন না। ত্বরিতে জামাকাপড় বদলে তাঁরাও ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে।

না নেমেও উপায় নেই। কীলারের চোখে বিদ্যুৎ। জলের আড়াল থেকেও ঝিলিক মারছে। যেন বলছে, 'যদি গাহন করিতে চাহ—'

মুহূর্তে স্যুইমিং পুলের চেহারা বদল। তিন পুরুষ আর এক নারীতে লুটোপুটি, মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া। কে আগে কীলারকে ধরবে, কীলারের কাছে ছুটে যাবে, তা'ই নিয়ে তিনজনের জোর রেষারেষি।

কীলার পরে নিজেই বলেছে, "আইভানোভকেই আমার ভাল লাগে। পুরুষ বলতে যা' বোঝায়, ও তাই। রোমশ বুক যেমন মজবুত, তেমনি চওড়া। দেখলেই কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেদিন, প্রফুমো-আইভানোভ সাক্ষাতের সেই প্রথম দিন আমি করে বসলুম এক কাণ্ড। মজার এক জলকেলি করতে গিয়ে আইভানোভকে নাকচ করে আমি লাফিয়ে উঠলুম জন প্রফুমোর ঘাড়ে।"

কেন সে এমন করল? কেন হঠাৎ প্রফুমোকে সে বেছে নিল? কীলার পরে আপনমনেই বলেছে, তার কারণ প্রফুমোর মত এমন স্মার্ট, এমন সপ্রতিভ বোধহয় কোটিতে গোটিক।

জলকেলি সেরে নৈশ-ভোজের আসর। আবার সেই আমোদ-প্রমোদ। আবার সেই ঘনিষ্ঠতা।

এল বিদায়ের ক্ষণ। কীলার উঠল আইভানোভের গাড়িতেই। প্রফুমো এগিয়ে এলেন। চোখে আগের দিনের প্রথম দেখার সেই মায়াবী দৃষ্টি। কীলারের কাছে তিনি তাঁর টেলিফোন নম্বর চাইলেন। বললেন—"আবার কবে দেখা হবে ?"

কীলার জবাব দিলে—"স্টীফেনের সঙ্গে কথা বলুন। তাঁর কাছেই আমার টেলিফোন নম্বর আছে। ওঁর আর আমার নম্বর এক। আমরা দুজনে এক ফ্ল্যাটেই থাকি।"

ফের লণ্ডন। এবার নিজের ফ্ল্যাটে নয়, আইভানোভের বাড়িতে। সেখানে সারি সারি ভদকার বোতল। বোতলের সেই তরল অনলে কীলার আর আইভানোভ আকণ্ঠ ডুবুডুবু।

তারপর একথা সেকথা, মাতামাতি দাপাদাপি। বাকি রাত অজান্তে ভোর।

দিন যায়। প্রমোদের ঢেউ একের পর এক এসে দুই তীর চুরমার করে দিয়ে যায়। হঠাৎ একদিন ফ্ল্যাটে টেলিফোনের কলকল নিনাদ। কার কণ্ঠস্বর ?—কীলার টের পায় প্রফুমোর।

প্রফুমো বললেন—'চল, মোটরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

"আমি রাজী, চলে আসুন—" কীলারের তৎক্ষণাৎ জবাব।

স্টীফেন তখন ফ্ল্যাটে নেই। প্রফুমো এলেন আধঘণ্টার মধ্যেই। বেরোল মদের গ্লাস। বেরোল দামী দামী মদের বোতল, তারপরেই হাওয়ায় পাল তুলে রোলস্‌রয়েস-তরণীর নিরুদ্দেশ যাত্রা। এবং প্রফুমোর মনে বসন্তীপবনের দোলা।

সেই দোলা থামে না। প্রতিদিন বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। ঘন ঘন তাই তিনি আসতে লাগলেন ওয়ার্ড-কীলারের ফ্ল্যাটে। এবং তখনই আসেন যখন ওয়ার্ড থাকেন বাইরে।

অবশেষে অনিবার্য পরিণতি। পঞ্চশরের চোখা চোখা তীর দুটি হৃদয়কে একসঙ্গে গেঁথে তুলল। প্রফুমো-কীলার একে অন্যের প্রেমে পড়লেন।

আর একটি রাত। অন্য রাতের মতই ছুটছে সুরা, হাসি আর কথার ফুলঝুরি। প্রফুমো হঠাৎ থেমে গেলেন।

হঠাৎ ঘরে সুচীপতননৈঃশব্দ্য। প্রফুমো ঘনিষ্ঠ হলেন, জড়িয়ে ধরলেন কীলারকে। তারপর সব স্থির, সব অস্থির।

কিছুদিন যেতে না যেতেই অবস্থা হয়ে গেল ঘোরালো। কীলার দেখল প্রফুমো, আইভানভ, ওয়ার্ড—তিনজনকেই সে ভালবাসে। তবে ইদানীং টানটা যেন প্রফুমোর দিকেই বেশী। অ্যাস্টর-কুঞ্জে অভিসার, লণ্ডনের ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা, মোটরে দূরপাল্লার পাড়ি—সবই চলছে, কিন্তু হঠাৎ এল বিচ্ছেদের দিন। কীলার আর প্রফুমো একদিন একেবারে আলাদা।

ইতিমধ্যে গোটা ব্যাপারটা ঘা দিয়েছে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। প্রফুমোর দায়িত্বপূর্ণ পদ বাধা হয়ে দাঁড়াল সামনে। নানা রকম লোকের ঘোরাফেরা শুরু হল এখানে সেখানে। এমনকি কীলার-প্রফুমোর টেলিফোন-আলাপেও যেন কারা অনবরত আড়ি পাতছে। তাছাড়া কীলার টের পেল, প্রফুমো কেমন যেন সন্দেহ করছে স্টিফেনকে। স্ত্রী ভালেরির ভয় তো ছিলই।

সে সময়েই একদিনের ঘটনা। প্রফুমো বললেন, "ক্রীস্টিন, চল আমার বাড়িতে। ভালেরি নেই, আয়ারল্যাণ্ড গেছে।" রিজেণ্ট পার্কে প্রফুমোর বাড়িতে আবার আর এক দফা হাসি-গান-তামাসা। ড্রয়িং রুমে বসে কীলার দেখল প্রফুমো-ভালেরির শোবার ঘর। কীলারের ভাষায়—"দেখে বড় ঈর্ষা হল আমার।"

প্রফুমো গাড়ি চালিয়ে সেদিনই অনেক রাতে এলেন কীলারের ফ্ল্যাটে। কীলারের মনে হল, প্রফুমো যেন অন্যমনস্ক, বোধহয় ভাবছেন তাঁর স্ত্রীর প্রতি অবিচারের কথা। এসেই নাটকীয়ভাবে বললেন—'বিদায়। আমার আর এখানে আসা চলবে না।'

কেন, কেন? কীলারের মনে তোলপাড়। কেন প্রফুমো তাকে ছেড়ে চলে যাবেন? সে ওঁকেও যে ভালবেসে ফেলেছে।

কিছুতেই কিছু হল না। মুহূর্তে সব শেষ। প্রফুমো চলে গেলেন এবং সেদিনই দুজনের শেষ দেখা।

তবে পরে প্রফুমোর লেখা তিনখানা চিঠি পেয়েছিল কীলার। তাতে সে জেনেছিল, কী অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন প্রফুমো।

তারপরের ঘটনায় দ্রুত পরিবর্তন। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতি, হই-চই, জনজীবনে আলোড়ন, পার্লামেন্টে বিক্ষোভ, এবং অবশেষে প্রফুমো কলঙ্কের ডালি নিয়ে পদত্যাগ করলেন সমর সচিবের পদ থেকে।

প্রফুমোর পদত্যাগ কীলারকে করল বিষণ্ণ। সে নিজেই বলেছে —"যাকে একবার ভালবেসেছি, তার অপমানে কষ্ট তো হবেই।"

ইতিমধ্যে তাঁর আর একজন প্রণয়ী গর্ডনের মামলা উঠেছে আদালতে। গর্ডন পেয়েছে শাস্তি। স্টীফেন ওয়ার্ডও হয়েছেন অভিযুক্ত। প্রফুমো-কীলার প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে হয়ে গেছে তুমুল বিতর্ক। হ্যারল্ড উইলসন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানকে। সারা দুনিয়া উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করেছে পরবর্তী পরিণতির।

কীলার ইতিমধ্যে তার বিবৃতিতে জড়িয়েছে আরও অনেক হোমরা-চোমরাকে। তাঁদের মধ্যে একজন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ। তিনিও নাকি গিয়েছিলেন লর্ড আস্টরের পল্লীকুঞ্জে। সেখানে সাঁতার কেটেছেন, সদ্যোস্নাতা কীলারের সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হয়েছেন। কীলার নিজেই বলেছেন, "আয়ুব গা ঘেঁষে সাঁতার দেবার সময় আমার পা ধরে আরও কাছে টানতেন। আয়ুবকে আমার ভাল লাগত। হ্যাঁ, পুরুষের মত পুরুষ বটে।"

পাকিস্তান অবশ্য প্রতিবাদ জানিয়েছে। বলেছে, আয়ুব খাঁ অ্যাস্টর-কুঞ্জে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সাঁতার কাটেননি, কেটেছেন অন্য একজন পাকিস্তানী।

ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠল আরও গুরুতর। আইভানভ-প্রফুমো-ওয়ার্ড-কীলার—এই চতুরঙ্গ চাতুরীর ফাঁকে অনেক গুপ্ত সামরিক তথ্য নাকি ফাঁস হয়ে গেছে। এদের কেউ কেউ নাকি দেশের শত্রু গুপ্তচর।

কিন্তু কীলারের নিজের বক্তব্য কী এ বিষয়ে? সে বলেছে, "না, আমি গুপ্তচর নই। আমি শুধু একজন বিনোদিনী। ভিষক ওয়ার্ড আমার শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ। ভিনদেশী আইভানভ ও অমাত্য প্রফুমো আমার প্রিয়বান্ধব। তার বেশী কিছু নয়।"

লণ্ডনের সলিসিটার মিস্টার মাইকেল এডোজ এদিকে বলেছেন, প্রফুমোর কাছ থেকে আণবিক অস্ত্র সম্পর্কে গোপন তথ্য জানার জন্যে আইভানভ কীলারকে অনুরোধ করেছেন। কীলার বলেছে—"এ অভিযোগ অসত্য।" তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার ঘটেছিল বটে। ব্যাপারটা এই। কীলারের একজন বন্ধু বলেন, জার্মানী কবে আণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হবে, সেই খবরটা প্রফুমোর কাছ থেকে জেনে দিতে। কীলার বলেছে, সে এই প্রস্তাবে রাজী হয়নি। কেননা প্রফুমোর সঙ্গে তার সম্পর্কে রাজনীতির নয় বিনোদনের—"জ্যাক আমার কাছে আনন্দ চেয়েছিল, আমি দিয়েছি।"

কীলার এডোজ সম্পর্কে আবার নতুন তথ্য দাখিল করেছে। এডোজও নাকি যেতেন কীলারের ফ্ল্যাটে এবং তার প্রতি নাকি তিনি আকৃষ্টও হন। একদিন ওঁরা দুজন এক জাপানী রেস্তোরাঁয় নৈশ-ভোজও সেরে আসেন।

এমনকি কেনসিংটনে এডোজের বাড়িতেও গিয়েছে কীলার। কীলারের কাছ থেকে অনেক কথা জানতে চান এডোজ। কীলার বলেছে, সে রাজী হয়নি।

কিউবার ব্যাপার নিয়েও অনেক কথা উঠল। কীলার-আইভানভ সম্পর্ক তাতে জোগাল আরও ইন্ধন।

আইভানভের সঙ্গে কীলারের পরিচয় করিয়ে দেন ডাঃ স্টীফেন

ওয়ার্ড। ১৯৫৯ সালে মেফেয়ারের এক ক্যাবারেতে। প্রথম দেখার ক্ষণ থেকেই আইভানভকে ভাল লেগেছিল কীলারের। কিছুদিন যেতে না যেতেই দুজনে হয়ে গেলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং রঙ্গমঞ্চে প্রফুমো আসার আগে পর্যন্ত একে অন্যের প্রেমে ডুবুডুবু।

আইভানভের হাতে অঢেল টাকা, তার উপর সে দিলদরিয়া। কীলারের ভাষায় "প্রতিটি মুহূর্ত তাই আমরা উপভোগ করতে লাগলাম।" তাদের মধ্যে আলাপের বিষয় কী ছিল?—"কেন, লণ্ডন, মস্কো, আইভানভের স্ত্রী?" হ্যাঁ, বার্লিনের কথাও একদিন উঠেছিল। কীলার বলেছে—"আমি জিগগেস করলাম রুশীরা কেন ওখানে রয়েছে?—আইভানভ তার কোন জবাব দেয়নি।"

গুপ্ত খবর? কীলার বলেছে—"না, তা নিয়ে আলোচনার অবসর আমাদের ছিল না।"

অ্যাস্টরের পল্লীকুঞ্জে, সুইমিং পুলে প্রফুমো-আইভানভের প্রথম সাক্ষাৎ। তখনও কীলার আইভানভের প্রেমে আচ্ছন্ন। এবং আইভানভের গাড়িতেই লণ্ডনের ফ্ল্যাটে ফিরল কীলার। সেই রাত্রেই অদৃশ্য চুম্বক দুজনকে টানল সন্নিকটে।

তারপর আসরে অবতীর্ণ জন প্রফুমো। খ্যাতিমান অভিজাত পুরুষ। কীলারের জীবনে এ আবির্ভাব স্মরণীয়। বিপদের কারণও। প্রফুমো নাটকীয়ভাবে এলেন তার জীবনে, চলেও গেলেন একই ভাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আইভানভ?—হ্যাঁ তাকে কীলার ভালবাসাসত। প্রফুমো?—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাঁকেও।

তবু কেউ-ই রইল না। দুজনে দু'পথে চলে গেল। থাকার মধ্যে রইল অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের আলোড়ন এবং ভবিষ্যতের তিক্ততা।

কীলার কাহিনীতে এখনও অনেক রহস্য অনুদ্ঘাটিত। শুধু রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল একটি অখ্যাত মেয়ে—যে দরিদ্রের

ঘরে জন্মেও, শৈশবে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েও জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায় ছুটে চলেছিল। একুশ বছরের জীবনে সবই পেয়েছে সে। কিন্তু বিখ্যাত হবার বাসনায় অভূতপূর্ব এক ভূমিকম্পে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল তার জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডকে, গোটা পৃথিবীকে।

কীলার বলেছে, 'আমি একটি সাধারণ ইংরেজ মেয়ে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, জীবনকে উপভোগ করা ছাড়া আর কিছু আমি চাইনি। যদি জানতাম, আমি হব অনেকের বিড়ম্বনার কারণ, হব ভূমিকম্পের কেন্দ্রমূল, তাহলে হয়তো এপথে এমনভাবে এগোতাম না, কিছুতেই না।"

একের পর এক খ্যাতিমান সুপুরুষকে ভূপতিত করিয়ে যে-মেয়েটি সারা বিশ্বে তুলেছে তীব্র আলোড়ন, মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত শত শত পতঙ্গ যার রূপের অনলে পুড়ে নিঃশেষিত, সেই 'সংহারিণী' ক্রিস্টিন কীলারের অন্ধকার অতীতে আলোকসম্পাত করতে অনেকেই আগ্রহী। লক্ষ লক্ষ কৌতূহলীর মনে জিজ্ঞাসা, অত্যুজ্জ্বল চিত্রতারকার জ্যোতিও যার কাছে ম্লান, যার নাম সকলের মুখে মুখে, সেই বিনোদিনী বিমোহিনীর শৈশব আর কৈশোর কি অন্য পাঁচটি ইংরেজ মেয়ের মত, নাকি জীবনের ঊষালগ্নেই খর মধ্যাহ্নের রৌদ্র তাণ্ডবে ধিকি ধিকি সে জ্বলে উঠেছিল ?

কীলার নিজেই বলেছে, না, অসাধারণ কোন কিছুই তার শৈশবে নেই। সে ছিল তার সঙ্গী আর সব মেয়েরই মত।—"আমার জন্ম ১৯৪২ সালের ২২-এ ফেব্রুয়ারী। মিডিলসেক্সে হেয়েজের শহরতলীতে, ৯৪, পার্ক লেনে। মা বলেছিলেন, জন্মের সময় আমার ওজন ছিল মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। বাবা ?—উঁহু, বাবার কথা মনে-ই নেই। বাবা ছিলেন ফিটার। আমার যখন বয়স

তিন মাস, তখন থেকেই মা-বাবা আলাদা। তিন মাস যখন তিন বছর, মায়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমার বিপিতার।"

এঁরা দুজন কীলারকে প্রাণ ভরে ভালবাসতেন। তাঁদের মনে ছিল অনেক আশা, মেয়ে বড় হবে, নাম করবে। তা নাম সে করেছে, কিন্তু এই ধরণের নাম, এত বৈভব, ওঁরা দুজন হয়ত কোনকালেই ভাবেননি। কীলারের ভাষায়—"এই পথে আমি নামব কুখ্যাতির শেষ ধাপে গিয়ে পোঁছব, আমার মা-বাবার কল্পনার বাইরে ছিল। আমার এই অধোগতির জন্যে তাঁদের আমি দোষী করব না। এ আমারই সৃষ্টি, এ আমারই নিয়তি।"

অতি দরিদ্রদশার মধ্যে কেটেছে কীলারের শৈশব। দামী পোশাক আর অভিজাত সঙ্গী, সবই সে সময় ছিল তার কাছে অসম্ভবের পায়ে মাথা খোঁড়ার জিনিস।

হেয়েজ থেকে তারা এল স্টেইনস-এর কাছে রোজবারীতে। ছোট্ট জোড়াতালি দেওয়া এক বাড়িতে।—"এই বাড়ি"—কীলার বলেছে—"আমার কাছে এখনও রাজপ্রাসাদের বাড়া। বিলাসবহুল কত বাড়িতে পরে থেকেছি, ঐশ্বর্যের আলোকে দেদীপ্যমান কত অট্টালিকায় প্রমোদ-তুফানে ভেসেছি, তবু আমাদের সেই ছোট্ট নড়বড়ে ভাঙা বাড়িখানার পাশে সব অসার, সব তুচ্ছ। এত শান্তি, এত স্বস্তি কোথাও আর পাইনি। বোধহয় আর পাবোও না।"

সেই জীবনের আরও কিছু কথা কীলারের মুখ থেকেই তুলে আনি।—"আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিল নদী। সেই নদী আমায় রোজ ডাকত। ছোট্ট আমি সকাল নেই, বিকাল নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সখ হত তার অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার বিপিতা একদিন এগিয়ে এলেন। আমার ইচ্ছে টের পেয়ে কোলে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। লুটোপুটি

খেলাম দুজনে। এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, আমি একজন পাকা সাঁতারু। জলকে আমি ভয় করি না। কিন্তু হায়, তখন কে জানত শুধু জল নয়, লাজলজ্জা, নিন্দা কুৎসা কিছুতেই পরে আমার ভয় হবে না এবং এই সাঁতারই হবে আমার এবং আরও অনেকের বিড়ম্বনার কারণ।”

“গাড়ি চালাতেও আমি শিখেছি বার বছর বয়সে। শিখিয়েছেন আমার সেই বিপিতাই। তিনি আমাকে ফুটবল ম্যাচেও নিয়ে যেতেন। সাহসী করার জন্যে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। অন্ধকারকে আমি ভয় পেতুম। তাই প্রায়ই আমাকে ঠেলে দিতেন একা, রাতের অন্ধকারে বাইরে। কোন পড়শী মেয়ে যদি আমাকে মারত, আর আমি যদি মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে আসতুম, তিনি আমাকে বকতেন। বলতেন—যাও, ওকে পাণ্টা-মার দিয়ে এসো, নইলে বাড়িতে ঢুকতে দেব না।”

এই বিপিতার স্মৃতি কীলারের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এবং ইনিই তাঁকে ইস্কুলে পাঠান, তার পাঁচ বছর বয়সে। আর পাঁচটি মেয়ের মতই তার স্কুল-জীবন। তবে দুষ্টুমিতে তার জুড়ি ছিল না। একবার ইস্কুলের বাথরুমে লুকিয়ে সিগারেট খেয়ে শাস্তি পেয়েছিল হেড মাস্টার মিস্টার জন রবসনের কাছে। সম্ভবত সেই তার প্রথম পাপ।

পড়াশোনা? কীলার বলেছে—“আরে দূর দূর, পড়াশোনার চেয়ে আমার বেশী নজর ছিল দুষ্টুমিতে। ক্লাসের মধ্যে মাঝে মাঝে ভাল লাগত কবিতার, আর কখনও-সখনও ছবি আঁকার। ব্যস, ওই পর্যন্তই, বাকি সময় শুধু হাসিঠাট্টা, ফাজলামো ইয়ার্কি।”

কীলার সমবয়সীদের সঙ্গে মিশত কদাচিৎ। সঙ্গী প্রধানত বড় মেয়েরা আর দামাল ছেলেরা। গাছে চড়ত, সাঁতার কাটত, ছুটে বেড়াত। আর সবাই মিলে গল্প করত এক আজব শহরের। সেই শহরের নাম লণ্ডন—অল্পবয়সী কয়েকটি কিশোর-কিশোরীর

কাছে রূপকথার জগৎ। তাঁদের একমাত্র বাসনা—কবে যাব সেই রূপকথার জগতে, কবে আমাদের জীবন সার্থক হবে?

কীলার ইস্কুলের ক্লাসে বেয়াড়াপনা কম করেনি। রান্নার ক্লাসে একদিন তো রাগের মাথায় রান্না-দিদিমণির গালে 'সড়াৎ' করে চড় বসিয়ে দেয়। এই চড় নিয়ে দারুন হইচই। কীলারকে আর ঢুকতে দেওয়া হল না রান্নার ক্লাসে। তাতে ওর মজাই। এক বন্ধুকে বলেছে "যাক বাবা, বাঁচা গেল, এই সময়টা খানিক আড্ডা মারা যাবে বাইরে।"

কিন্তু এ তো গেল দুষ্টুমির কথা, যার রূপে আজ শত শত পুরুষ পাগল, কৈশোরে সে কেমন ছিল? মোহিনী মায়া কি তখনও তার চোখে ঢেউ খেলাত? কীলারের কি সেদিনের সেকথা মনে আছে? —আছে। সে বলেছে—"কৈশোর পেরোবার আগেই আমার দেহে যৌবন ছুঁই-ছুঁই। সমবয়সী মেয়ের তুলনায় আমার দেহ ছিল অনেক সুগঠিত, সুবিন্যস্ত। যৌবন ছিল দুকূলপ্লাবী। ঝাঁকড়া লাল চুল হাওয়ায় এলিয়ে আর ধবধবে সাদা জানুদেশে হলুদ 'বিকিনি' ছড়িয়ে আমি যখন উদ্দাম জলে নামতাম, সঙ্গী ছেলেদের কামনা বাঁধ মানত না, তারা চীৎকার করে উঠত, শিস দিয়ে আকাশ ফাটাত।"

সারা দেহে এই আকস্মিক বসন্ত সমাগমে, শুকনো পাতার ডালে ঝড়ের আগমনে কীলারের নিজের মনেও পুলকের অবধি ছিল না। নিজেকে সে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে। দেখে নিজেরই বিস্ময় লেগেছে। আপন মনেই বলেছে—'এ কী দেখি, এ কে এল মোর দেহে?" মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, সে যেন এক স্বপ্নলোকের রাজপুরী—মহলে মহলে যার রহস্যের হাতছানি। কখন বা মনে হয়েছে, সে যেন অগাধ সমুদ্রের বুকে হঠাৎ ভেসেওঠা এক নির্জন দ্বীপ—যুগযুগান্ত ধরে যার বুকে কোন মানবের পদচিহ্ন পড়েনি।

অদ্ভুত সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত সেই পুলক-আস্বাদন। যে রূপ-সম্ভার তিলে তিলে তার সর্বাঙ্গে দানা বেঁধে অনাস্বাদিত এক বিহ্বলতার তুফান ছুটিয়েছে, তার রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্মে কীলার প্রিয়বান্ধবী মৌরীনকে নিয়ে নিভৃতে বসে। এবং মৌরীনের নব নব ব্যাখ্যায় সে আরও বিমোহিত হয়। এই নবযৌবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাসেই দুই বান্ধবী সেদিন ঘনিষ্ঠতর।

এই মৌরীনকে নিয়ে কীলার কোন এক রবিবারে প্রথম যায় সিনেমা দেখতে। সাইকেলে, শহরের ঠিক মাঝখানে। তাদের বাড়ি ফেরার কথা সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে। কিন্তু সিনেমা দেখে বাড়ি আসার পথে সব ভণ্ডুল।

এক পাল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে চলছিল। সাইকেল থামিয়ে ওরা দুজন নেমে পড়ল। যোগ দিল ওই ছোকরাদের হাসি-ঠাট্টা-গানে। স্ফূর্তির চোটে ঘণ্টা মিনিট কোন্ দিকে পালিয়ে গেল টেরই পেল না।

বাড়ি যখন ফিরল, তখন রাত দশটা। আন্দাজ আগেই করেছিল জোর ধমক আছে কপালে। ঠিক তাই।

কীলার মিথ্যে বানিয়ে বললে—'পথে সাইকেল বিগড়ে গিয়েছিল।'

কিছুতেই কিছু হল না। শাস্তি এল অনিবার্য। সাত দিনের জন্মে সে ঘরে বন্দী।

কীলার যখন পঞ্চদশী, যখন সে রূপের চতুর্দশ কলা পূর্ণ করে পূর্ণিমায় পৌঁছব পৌঁছব করছে, ঠিক সেই সময় চুকিয়ে দিল পড়াশোনার পাট, ছেড়ে দিল ইস্কুল।

ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে এল এক বিরাট শূন্যতা। এতদিন ছিল বন্ধুবান্ধবের মাঝখানে, 'আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে। কিন্তু এখন, এখন সে কী করবে? তার মা-বাবারও কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

কিছুকালের জন্মে মুক্ত জীবন। বয়স কাঁচা, মনও তাই। এদিক-ওদিক ঘুরে কীলার নতুন অনেক কিছু জানতে পারল। দেখল, আগেকার মত আর শুধু হাসিঠাট্টা নয়, আশেপাশের পরিচিত অনেক ছেলে তাকে দেখছে অন্য দৃষ্টিতে। তাদের চাউনিতে লালসা, ভঙ্গীতে লালসা, তারা বাড়তি আরও কিছু যেন চায়।

কীলারের এসব ভাল লাগে না। সে বলেছে—"বিচ্ছিরি লাগে ছেলেদের হ্যাংলাপনা। এই সময় পেলাম একটা চাকরি। বাড়ির কাছেই এক অফিসে রেসিপশনিস্টের। নতুন চাকরির পয়লা দিন থেকেই দেখি আমার "বস্" অকারণে ঘুরঘুর করছেন আমার টেবিলের সামনে। কথাও বলছেন ইনিয়ে-বিনিয়ে। ইঙ্গিতটা টের পেলাম, কিন্তু ধরা দিলাম না।"

শুধু বড়কর্তা নয়, আর একটি ছোকরাও কীলারের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। একই ইঙ্গিত, একই প্রয়োজন। কীলার তিতিবিরক্ত হয়ে চাকরি ছেঁড়ে দিল। নিল বেবি-সীটারের পার্টটাইম চাকরি। ও হরি, সেখানেও এক অবস্থা। "ছোট বাচ্চাটির বাপ"—কীলারের ভাষায়—"কাজের পর সন্ধ্যেবেলা আমাকে রোজ বাড়ি পৌঁছে দিত। একদিন পথে হঠাৎ জড়িয়ে ধরল, চুমু খেতে চাইল। ভীষণ অবাক হলাম, রাগও হল। তবে মনে মনে খানিক গর্ব অনুভব করলাম। আমি তাহলে বেশ বড় হয়ে গেছি।"

কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবী অন্য চেহারা নিয়ে দাঁড়াল কীলারের সামনে। রূপে-রসে-গন্ধে-গানে বিচিত্র তার আকর্ষণ। এই আকর্ষণ তাকে অনবরত টানতে লাগল। সে আর ঘরে থাকতে পারল না, একদিন কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এবং বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে গেল দূর থেকে দূরে, দূরান্তরে।

টেবিল টেনিসের সাদা বলের মত এদিক-ওদিক ধাক্কা খেতে

খেতে কীলার পৌঁছল স্লাউ। চাকরি নিল এক ট্রেডিং এস্টেটে। থাকার ব্যবস্থা হল কাছের বোর্ডিং হাউসে। এ চাকরিও ছাড়তে হল। কেননা, কীলার টের পেল তার দেহের পূর্ণ যৌবন বোর্ডিং হাউসের কীপারকে পাগল করে দিয়েছে। একদিন লোকটা তার শ্লীলতাহানির জন্যে হাত বাড়াল। কীলার পালিয়ে গেল।

পালিয়ে গেল, কিন্তু মনে থেকে গেল স্লাউয়ের মধুর স্মৃতি! সেখানে দুটি সেলসম্যানের সঙ্গে হয়েছিল তার দোস্তি। ছেলে দুটির চেহারা যেমন দারুন, কথায়-বার্তায় তেমনি চৌকস। তাদের লণ্ডনে সুইস কটেজে এক ছোট্ট ফ্ল্যাট ছিল। কীলার চলে এল সেই ফ্ল্যাটে।

এল লণ্ডন—তার স্বপ্নের জগতে। শিশুকাল থেকে এই একটিমাত্র জায়গায়ই তার মনপ্রাণ জুড়ে বসেছিল। সেই স্বপ্নের জগতে এসে কীলারের মনে হল তার জীবন সার্থক হয়েছে, সফল হয়েছে।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কীলার পেল এক চাকরি সোহো পাড়ায়। একটি জামার দোকানে টাইপিস্ট ও মডেলের কাজ। এখানে এসে সে অনেক সেয়ানা। পর-পুরুষের ইঙ্গিতে আর সে অস্বস্তিতে পড়ে না, বরং পাল্টা ইঙ্গিতে তাদের কাছে টেনে আনে।

এই আশ্চর্য মুহূর্তগুলো সম্পর্কে কীলারের জবানবন্দী: "হঠাৎ হয়ে গেল যোগাযোগ। কয়েকজন মার্কিন এয়ারফোর্স অফিসার আমাকে তুলে নিয়ে গেল তাদের ডেরায়। তারপর গ্লাসের পর গ্লাস মদ, আর প্রহরের পর প্রহর বাঁধভাঙা হাসি। মদের ফেনা, হাসির ফেনা একসঙ্গে মিশে আমার জীবনে তখন এক অভূতপূর্ব আনন্দ। এত আনন্দ কোনদিন পাইনি। আমার সারা দেহ সেই আনন্দে রোমাঞ্চিত, শিহরিত, প্রতি রোমকূপে পুলক-বেদনা।

"ফৌজী লোকদের একটিকে আমার বেশী ভাল লাগত। সে

সার্জেণ্ট, থাকত লালেহাম, স্টেইনজের কাছে। বয়সে সে ছিল আমার বাবার বয়সী। কিন্তু তবু তাকে আমার কী যে ভাল লাগত! তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারতাম না'। প্রতি হপ্তায় উইক-এণ্ড তাই কাটাতাম তার সঙ্গে, এক ঘরে।

"এই সময়গুলো আমার জীবনে পরম রমণীয়—কোনদিন ভুলব না। কিন্তু হঠাৎ দেখা দিল এক বিপদ। টের পেলাম আমি অন্তঃসত্ত্বা—আমার দেহে আর একটি জীবনের স্পন্দন।

"আমার বয়স তখন সতেরো। আকস্মিক এই বিপর্যয়ে আমি দিশেহারা। কী করি কী করি? একবার ভাবলাম নষ্ট করে দিই, কিন্তু পারলাম না। মায়া হল। মনে হল এক অপরাধ দিয়ে অন্য অপরাধ ঢাকা অনুচিত। তা ছাড়া যে আসছে, হোক সে অবৈধ, তার তো কোন অপরাধ নেই। তবে কেন তাকে এই আলোর জগৎ থেকে অন্ধকারের বুকেই চিরনির্বাসন দেব?

"সন্তানের জন্ম হল। একটু অসময়েই। তারিখটা মনে আছে —১৯৫৮ সালের এপ্রিল। জন্মমুহূর্ত থেকেই সন্তানটিকে আমি ভালবেসে ছিলাম। তার নাম দিয়েছিলাম পিটার। তাকে কোলে নিতাম আর বারবার আওড়াতাম—"এ আমার ছেলে, এ আমার। এই আদরের ধনকে কিন্তু বেশী দিন রাখতে পারলাম না, সে চলে গেল। মাত্র ছদিন সে বেঁচেছিল।"

ছেলেটির মৃত্যুতে কীলারের মনে এল তিক্ততা, এল বিস্বাদ। তবে তার মা ও বিপিতা এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। অভয় দিয়ে বলেছিলেন, কোন অন্যায় সে করে নি, জীবনে এ রকম হয়েই থাকে। ঠিক সেই বিপদের সময় আর একটি চেনা ছেলে কীলারের পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে—"ক্রীষ্টিন তোমায় আমি বিয়ে করতে রাজী।"

কীলার ছেলেটির মহানুভবতায় খুশী হয়; কিন্তু বিয়ে করতে রাজী হল না। ছেলেটি কীলারকে সত্যি ভালবাসত এবং সেই

কারণেই অসম্মতি আসা মাত্র চরম আঘাত পেল সে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাকে শেষ পর্যন্ত পাঠাতে হয় এক মানসিক রোগের হাসপাতালে। কীলার এই ছেলেটি সম্পর্কে বলেছে—"এই প্রথম একটি ছেলে আমাকে ভালবেসে দুঃখ পেল। আজ তার জন্যে আমার দুঃখও কম নয়।"

পিটারের মৃত্যুর পর ভগ্নস্বাস্থ্য কীলার ফিরে এল লণ্ডন। সেখানে এক গ্রীক ছোকরার আনুকূল্যে বেকার স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় পেল ওয়েট্রেসের চাকরি। কীলার তার জবানবন্দীতে বলেছে—"সেই রেস্তোরাঁতেই এক মেয়ে ক্রেতার সঙ্গে আলাপ। মেয়েটি এক ক্যাবারেতে কাজ করে। ক্যাবারেটি ওয়েস্ট এণ্ডের পয়লা নম্বরী নাইট ক্লাব। ক্লাবের কথা শোনামাত্র আমি উৎসাহ বোধ করলাম। তৎক্ষণাৎ ইন্টারভিউ দিয়ে যোগ দিলাম মারে'জ ক্যাবারে ক্লাবে। এবং তারপর থেকে শুরু হল অন্য জীবন। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত আসে। আমি আর দশটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে জামাকাপড়ের খোলস ছুঁড়ে ফেলে এক ঘর লোকের সামনে বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গে দাঁড়াই। লুব্ধ দর্শকের দল আমার সুঠাম গৌরতনু দেখে পাগল হয়ে যায়।"

কীলারের প্রথম প্রথম বাধ বাধ ঠেকত। ফ্লোরে আসার আগে প্রচুর মদ খেয়ে লজ্জা সামাল দিত। পরে অভ্যেস হয়ে গেল, পেয়ে গেল নবতর রসের স্বাদ। প্রথমে দক্ষিণা ছিল হপ্তায় ৮ পাউণ্ড ১০ শিলিং। পরে বাড়তে বাড়তে ৩০ পাউণ্ড। কীলার তখন আরও শেয়ানা। শ্যাম্পেনের গেলাস হাতে টেবিলে টেবিলে ঘুরে খদ্দের পাকড়াচ্ছে, আশনাইয়ের নানা কেরামতি দেখিয়ে তাদের বশে আনছে।

তখনকারই এক রাত। কোণের টেবিলে বসে ছিল এক বাঁধা খদ্দের—জাতে আরব। সে কীলারকে ডাক দিল। কীলার তার টেবিলে গিয়ে বসল এবং সেদিনই, সেই টেবিলে বসে তার

জীবন-নাট্যে আর একটি অঙ্কের সূত্রপাত।—"সেই টেবিলেই আরব খদ্দেরটি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অভিনেত্রী ক্লেয়ার গর্ডনের সঙ্গে সঙ্গে। ক্লেয়ারের সঙ্গে একজন ভদ্রলোক। তার সঙ্গেও পরিচয় হল। নাম এই প্রথম শুনলাম— "ডাঃ স্টিফেন ওয়ার্ড।" ওয়ার্ডকে দেখেই আমার ভাল লাগল। এ চেহারা সাধারণ নয়। তাছাড়া তার দৃষ্টিতে জাদু আছে। তাঁর নীল চোখ জোড়া অপলক আমার দিকে নিবদ্ধ। আমি পুলকে বিমূঢ়। তা ছাড়া ওয়ার্ডের গলার স্বর বড় মোলায়েম, বড় মিষ্টি। আমি মুহূর্তে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

"এই আত্মসমর্পণের আরও কারণ আছে। ডাঃ ওয়ার্ড যখন হাসেন, মুক্তা ঝিলিক মারে। যখন হাত নাড়ান, সুদৃঢ় পেশী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যখন ঘাড় ফেরান, সুপুষ্ট চওড়া কাঁধ অতীত যুগের বীরপুরুষের স্মৃতি বয়ে আনে। চলনে বলনে এক আশ্চর্য পুরুষ, যে কেউ সম্মোহিত হবে। আমিও হলাম। ভুলে গেলাম সেই আরবকে। আমি তখন থেকেই ডাঃ ওয়ার্ডের।"

ডাঃ ওয়ার্ড ক্লেয়ার গর্ডনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরলেন। কীলারের টেলিফোন নাম্বার জেনে নিলেন ওই আরবের কাছ থেকে।

তারপর শুরু হল রোজ টেলিফোন—"হ্যালো ক্রীস্টিন, আমি স্টীফেন।" দিনে অন্তত পাঁচবার। একথা সেকথা, নানা কথা। দেখা করার অছিলা।

একদিন ডাঃ ওয়ার্ড কীলারের কাছে এসে হাজির। বললেন—, "চল বেড়িয়ে আসি। কাছেই আমার এক 'কটেজ' রয়েছে।"

কীলার ওয়ার্ডের সঙ্গে গেলেন এবং জানতে পারলেন—এই কটেজই হচ্ছে লর্ড অ্যাস্টরের ক্লাইভডেন এস্টেট—যেখানে তার জীবনের আসল নাটক শুরু।

সে নাইট ক্লাবের চাকরি ছাড়ল। উঠল ক্রমওয়েল রোডে

এক নতুন ফ্ল্যাটে। সেই ফ্ল্যাটে থাকে আর একটি মেয়ে তার নাম ম্যাণ্ডি রাইস ডেভিস।

কীলারের জীবননাট্যে এই মেয়েটির ভূমিকা পার্শ্বচরিত্রের নয়, সহনায়িকার। ওয়ার্ড-ম্যাণ্ডি-কীলার এই তিনজনে মিলে লর্ড অ্যাস্টরের পল্লীকুঞ্জ ক্লাইভডেন হাউসে যে ঝড় তুলেছিল, তারই দোলা কাঁপিয়ে দিয়েছে গোটা ইংল্যাণ্ডের ভিত। ওয়ার্ড আত্মহত্যা করেছেন। অনেকে ভূপতিত, অনেকে সশঙ্কিত।

'এ ক্রিকেট নয়'

ক্রিকেট খেলতে আসেন অনেক বিদেশী দল। অসট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইনডিজ, পাকিস্তান। আমরা মাঠে যাই, খেলা দেখি; ভারত জিতলে হাততালি দিই, হারলে মন খারাপ করে বাড়ি ফিরি। বাইরে থেকে সাধারণ লোকে যা দেখে, তা শুধু মাঠের ব্যাটিং-বোলিং-ফিলডিং, আর খবরের কাগজে খেলার বিবরণ। বিদেশী দল যে-কদিন থাকেন, উত্তেজনা আর মাতা-মাতি থাকে সর্বত্রই। সিরিজ শেষ হতেই আবার সব যে-কে-সেই।

কিন্তু মাঠের খবর ছাড়া অন্দরমহলের খবরও থাকে অনেক কিছু। বিদেশী দলের ম্যানেজারের দুশ্চিন্তা, খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কেন না ক্রিকেট তো শুধু খেলা মাত্র নয়, রীতিমত যুদ্ধজয়ের ব্যাপার। ক্রিকেটের ক্যাপটেনের বুদ্ধি, বিবেচনা, ভাবনা লড়াইয়ের ক্যাপটেনের চেয়ে বেশী বই কম লাগে না। তাছাড়া রয়েছে, নানা রকম আদবকায়দা, সামাজিক কানুন। কেন না ক্রিকেট যে রাজার খেলা। খেলার রাজাও।

আবার অনেক সময় ক্রিকেট দলের এমন সব ভিতরের খবর জানা যায়, যা দিয়ে আলাদা সরস কাহিনীও লেখা যেতে পারে। এই ধরণের এক সরস ব্যাপার ঘটেছিল ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানী ক্রিকেট দলের ভারত-সফরের সময়। ব্যাপারটা চাপাই ছিল। হঠাৎ একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' সেই সফরের সব নেপথ্য সমাচার ফাঁস হয়ে পড়ে।

ওই সফরে পাকিস্তানী দলের ম্যানেজার ছিলেন জাহাঙ্গীর খান।* একদা ভারতীয় দলের খ্যাতিমান টেস্ট ক্রিকেটার।

ক্যাপটেন ছিলেন বাঘা বোলার ফজল মামুদ। ফজল আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোরা কলকাতা, বোমবাই, দিল্লিতে খেলার মাঠের ভিতরে বাইরে এমন সব কাণ্ডকারখানা চালান, যাতে জাহাঙ্গীর খান বাধ্য হন ওদের উপরওয়ালার কাছে এক গোপন রিপোর্ট পেশ করতে। এই কাহিনী সেই রিপোর্টেরই সারাৎসার, এবং বলা বাহুল্য, রহস্য-উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর এই পঞ্চাংক নাটকের কুশীলব পাকিস্তানী খেলোয়াড়ের দল। মাত্রাতিরিক্ত সুরাসক্তি, নারীঘটিত বেলেল্লাপনা খেলার মাঠে অভদ্রতা, ধিক্কারজনক নানা কাজ—সব মিলিয়ে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার একেবারে রহস্য-লহরী সিরিজের 'নবতম অবদান।'

করাচি ছাড়বার আগে এবং পুণায় পৌঁছে জাহাঙ্গীর খান দলের সবাইকে শৃঙ্খলা-রক্ষায় তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্যে কর-জোড় অনুরোধ জানান। তাছাড়া সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, ভারত-ভ্রমণের প্রতিদিন, দলের সবাই নিজেদের আস্তানায় অতি অবশ্য ফিরবেন রাত দশটার মধ্যে।

ফজল খেলা শুরু করলেন খারাপভাবে। পুণার প্রথম ম্যাচে তাঁর 'বল' ঠিক মত পড়ল না। বিজয় মার্চেণ্ট বেতার-ভাষণে ফজলের কড়া সমালোচনা করলেন। মার্চেণ্টের মতে এ ফজল সে ফজল নয়; এখন তাঁর শরীর ভারী, বোলিংয়ের সময় হাতও ঠিক ওঠে না।

এই মন্তব্য পরদিন খবরের কাগজে বেরোল। ফজল বে-চাল হয়ে গেলেন। ডাকসাইটে বোলার ফজলের খ্যাতির পক্ষে এই মন্তব্য সাংঘাতিক।

ফজল যে বেচাল হয়ে পড়েছেন, তা বুঝা গেলে, দ্বিতীয় ইনিংসে ইমতিয়াজের সঙ্গে 'ওপেনার' হিসাবে ব্যাট করতে তাঁর নামা

দেখে। তিনি ৩০ রান করলেন। তারপরই হঠাৎ বিশ্রাম নিলেন উরুর পেশীতে টান পড়েছে অজুহাত দিয়ে।

'ওপেনার' হিসেবে নামার কারণ, সম্ভবত ফজল ভেবেছিলেন, বোলিংয়ে উইকেট না পেলেও তিনি ভাল রান তুলতে পারবেন।

পরবর্তী খেলা বরোদায়। ফজল এই খেলায় অনুপস্থিত রইলেন। আহমেদাবাদে তৃতীয় খেলার দ্বিতীয় দিনে তিনি আবার পেশীর টানের দোহাই পেড়ে ফিল্ড্ করতে নামলেন না।

আহমেদাবাদ থেকে বোম্বাই। এবারে প্রথম টেস্ট ম্যাচ। গণ্ডগোলের সূত্রপাত এইখানেই। বোম্বাইয়ের দুই ফিল্ম ডিরেক্টার পাকিস্তানী ক্রিকেট দলকে এক নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত করতে চাইলেন। এঁরা দুজন লাহোরের লোক। ফজল দুটো নিমন্ত্রণই গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। জাহাংগীর খান কিন্তু ফজলকে বললেন, এ ধরনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করাই ভাল। ফজলের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত জাহাংগীর খান একটি মাত্র নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজী হলেন।

ডিরেক্টারের বাড়ীতে পার্টি বসল। আমোদ আনন্দে আসর জমজমাট। ছেড়ে আসতে কারও মন চায় না। তবু অনেকে রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ঘরে ফিরে এলেন। এলেন না দলের 'সিনিয়র' কয়েকজন। রাত যখন প্রায় কাবার, তখন তাঁদের দেখা গেল নিজ নিজ ঘরে।

পরদিন সকালে জাহাংগীর খান দলের সবাইকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, রাত দশটার মধ্যে হোটেলে ফেরার প্রতিশ্রুতির কথা।

প্রথম টেস্ট ম্যাচের আগের দিন ইমতিয়াজ, মামুদ হোসেন এবং সুজাউদ্দীনের স্ত্রী বোম্বাই এসে হাজির। মহিলাদের থাকার পৃথক ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও দেখা দিল নতুন সমস্যা। তিনজনের তিন স্ত্রীকে খেলার পর আপ্যায়িত করতে হয় এবং দেখা গেল,

ইমতিয়াজ, মামুদ, সুজাউদ্দিন, কেউই আর রাত দশটার মধ্যে ঘরে ফিরছেন না।

প্রথম টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিন। বিব্রত জাহাংগীর খান দলের সবাইকে আবার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে হুঁশিয়ারি দিলেন। বললেন, —রাত দশটার মধ্যে কেউ ঘরে ফিরছেন না, কে কোথায় হাওয়া খেতে যাচ্ছেন, চুক্তিমত তাও ম্যানেজারকে জানানো হচ্ছে না। এ চলবে না।

প্রথম টেস্ট ম্যাচের আগেকার তিনটি ম্যাচে জাহাংগীর খান লক্ষ্য করেছেন, খেলার সময় পাকিস্তান দলের একজন না একজন আহত হচ্ছেন এবং ফিল্ড করতে মাঠে আসছেন না। একটি ম্যাচে তিনজন বদলী খেলোয়াড়কে ফিল্ড করতে হয়।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হবার আগে জাহাংগীর খান বলেন, অনবরত বদলী খেলোয়াড় নেওয়া দলের পক্ষে ক্ষতিকর, তাই সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকলে কেউ যেন খেলতে না নামেন। যাঁরা নির্বাচিত হলেন, সবাই ম্যানেজারকে জানালেন, তাঁরা সুস্থ এবং পাঁচ দিনের ধকল সহ্য করতে প্রস্তুত।

প্রথম টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিন কিন্তু দেখা গেল, ফজল নিজেকে খেলার পক্ষে অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

তিনি টসে জিতেছেন এবং দ্বিতীয় দিনের চায়ের বিরতি পর্যন্ত দলকে ব্যাট করিয়েছেন। ফজল নিজে ব্যাট করার সময় দু' রান করেন এবং বল করেন ছ ওভার। তার মধ্যে তিন ওভার বল মোটেই জোরালো নয়। পরদিন ফজল বল করলেনই না। ফিল্ড করলেন ফার্স্ট স্লিপ বা লেগ স্লিপে। লেগ স্লিপের দরকার আছে কি না সে কথা আদৌ না ভেবেই।

খবরের কাগজে কড়া মন্তব্য বেরোল। ওরা লিখল, শরীর ভাল না থাকলে ফজলের খেলা উচিত নয়।

চতুর্থ দিন ফজল ফিল্ড করতেই নামলেন না। দলের নেতৃত্ব

নিলেন ইমতিয়াজ। ফজলের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ৩০০ রানের মধ্যে ৮টি ভারতীয় উইকেট পড়ে গেল। এলেন দেশাই আর যোশী। এঁরা দুজন পাকিস্তানের বোলিং কেয়ার না করে বেদম পেটাতে লাগলেন! মামুদ এবং ফারুক দু' দিন খুব খাটলেন। কিন্তু তাঁদেরও চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। ফজলের অভাব বেশী করে অনুভূত হল। এদিকে দেশাই-যোশী জুটি ৯৬ রান করে অপরাজিত রইলেন।

চতুর্থ দিনের সকাল। বোম্বাইয়ের চিকিৎসক ডাঃ প্যাটেল টেলিফোনে জাহাংগীর খানকে জানালেন ফজলের আর মাঠে না নামাই ভাল।

জাহাংগীর খান টেলিফোনে ডাঃ প্যাটেলের মতামত ফজলকে জানালেন। কিন্তু একরোখা ফজল বল্লেন, তিনি মাঠে নামবেনই।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের অনুরোধ ফজল মানলেন।

কিছুক্ষণ পর প্রভাতী সংবাদপত্র দেখে জাহাংগীর খান কিন্তু অবাক। এই টেস্ট ম্যাচে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় বলে কাগজে ফজলের এক বিবৃতি বেরিয়েছে। ফজল পরে টেলিফোনে জাহাংগীর খানের কাছে এই ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

ঐদিন সন্ধ্যেবেলা ফজল পুরো দলকে নিয়ে এক ফিল্ম ডিরেক্টরের বাড়িতে ডিনার খেতে গেলেন। কয়েকদিন আগে এই ডিরেক্টরের নিমন্ত্রণই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। জাহাংগীর খান এই ডিনার পার্টির কিছুই জানেন না। সন্ধ্যেবেলা দলের লোকদের নিতে এক ঢাউস বাস হাজির দেখে তিনি ব্যাপারটা টের পেলেন। সেই মুহূর্তে বাধা দেওয়া অনুচিত বলে জাহাংগীর খান তখন কিছু বললেন না।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা বোম্বাইয়ের এক খ্যাতনামা ক্রিকেট-

সমালোচক জাহাংগীর খানকে জানালেন, তিনি ফজলকে বলেছেন, অসুস্থ শরীরে খেলে ফজল যেন দলের সর্বনাশ না করেন।

ভদ্রলোক আরও জানালেন, নেতৃত্ব করা সম্পর্কে ইমতিয়াজের কোন ধারণা নেই। এবং মামুদ ও হানিফ নিজেদের সুবিধে মত নিজেরাই ফিল্ডম্যানদের জায়গা বদল করে দেন। ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের কমিটি রুমে অন্যান্য ক্রিকেট খেলোয়াড়রাও ঐ একই মতামত ব্যক্ত করেন।

খেলার সময় ফজল এক অপ্রীতিকর কাজ করে বসলেন। প্রথম ইনিংসে তাঁকে এল বি ডব্লু আউট দেওয়া হল। কিন্তু তিনি ক্রিজ ছাড়তে নারাজ। বললেন, 'যাব না, আমি আউট হইনি।' তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত তিনি যখন ক্রিজ ছাড়লেন, দর্শকের দল টিটকারিতে মাঠ কাঁপাল। পশ্চিম পাকিস্তানের আই জি পি শ্রীশরিফ খানের নজরেও ঘটনাটি পড়ল। তিনি ফজলের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন।

প্রথম টেস্ট ম্যাচের শেষ দিন জাহাংগীর খান ফজলকে ডেকে বললেন যে, তিনি দলকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন এবং তাঁর আচরণ নিয়ে দলের ছোটরাও সমালোচনা করছে। জাহাংগীর খান একথাও বললেন যে, ক্যাপ্টেন হিসাবে ফজলের উচিত দলকে উদ্বুদ্ধ করা।

জাহাংগীর খান একথাও জানালেন যে, ম্যানেজারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফজল ফিল্ম ডিরেক্টরের ডিনার পার্টিতে দলকে নিয়ে গেছেন এবং প্রতিদিন নিজের ঘরে বেশী রাতে ফিরছেন।

ফজল ক্ষমা চাইলেন এবং আশ্বাস দিলেন ভবিষ্যতে সাবধান হবেন।

এদিকে আবার নতুন বায়না। চিকিৎসার জন্য বোম্বাই-এ আরও কিছুদিন থাকার জন্য ফজল জাহাংগীর খানের অনুমতি চাইলেন। বললেন, দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের সময় তিনি অবশ্যই কানপুরে পৌঁছবেন।

জাহাংগীর খান জবাব দিলেন, তিনি আগেই একথা কানাঘুঁষোয় শুনেছেন। ফজল যদি দলের সঙ্গে সঙ্গে না যান, তাহলে ক্যাপ্টেনের উপর অন্যান্য সকলের আস্থা নষ্ট হবে এবং দলগত মনোবল একেবারে ভেঙে পড়বে। ফজল নিতান্ত অনিচ্ছায় বোম্বাই পড়ে থাকার বাসনা বাতিল করে দিলেন।

আবার টেস্টের প্রসংগ। দ্বিতীয় উইকেটে হানিফ ও সয়ীদ জুটির প্রশংসনীয় সাফল্যের পর পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানেরা কি রকম যেন বে-চাল হয়ে গেলেন। তাঁরা একে একে আউট হতে লাগলেন। এই সংকটের মুখে ক্যাপ্টেন ফজল দাঁড়াতে পারলেন না। জাহাংগীর খানকে বললেন, এমন দুরবস্থা আর কিছুক্ষণ চললে নির্ঘাৎ তিনি হৃদ্‌রোগের কবলে পড়বেন।

দেখা গেল, ফজল সাহস হারিয়ে ফেলেছেন, ড্রয়িং রুমের টেবিলে সটান শুয়ে পড়েছেন।

…"He was completely un-nerved and shattered. He looked pale and seemed to have been weighed down by the occasion. His leadership began to show signs of bankruptcy and the sight was indeed pathetic."

ম্যানেজার জাহাংগীর খানের জবানীতে 'রণক্লান্ত ক্রিকেট-সেনাপতির' এই করুণ চিত্র সত্যই মর্মন্তুদ।

রাত দশটার মধ্যে ঘরে ফেরার নিয়ম বোম্বাইয়ে অনেকেই মানেননি এবং নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দলের প্রবীণ খেলোয়াড়রা ম্যানেজারের বিনা অনুমতিতে যথেচ্ছ বিহারে যখন তখন বেরিয়ে পড়েছেন। অথচ প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরদিনের খেলার চাল কী হবে, না হবে, তাই নিয়ে ম্যানেজার সহ সকলের আলোচনা করার কথা ছিল।

নাগপুরে পৌঁছে জাহাংগীর খান নোটিশ জারি করলেন, রাত

৮টা থেকে ৮-৩০ মিঃ মধ্যে' দলের সবাই একসঙ্গে হোটেলে বসে খাবেন এবং যেদিন খেলা থাকবে না সেদিন একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন হবে দুপুর ১টা থেকে ১-৩০ মিঃ মধ্যে। ম্যানেজারের অনুমতি ছাড়া কোন বেসরকারী ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ না নেবার নির্দেশও দেওয়া হল।

হানিফ এবং মুনাফ বোম্বাই ও আমেদাবাদে কোন সরকারী পার্টিতে যোগ দেননি। ম্যানেজার সরকারী পার্টিতে যোগদান আবশ্যিক করে দিলেন।

জাহাঙ্গীর খান বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত, লজ্জিত। একদিকে হানিফ আর সুজাউদ্দিনে মর্যাদার লড়াই, অন্যদিকে খেলার মাঠে ও বাইরে অধিনায়ক ফজলের দুর্বিনীত ব্যবহার। কানপুরে, কলকাতায়, দিল্লিতে প্রায়ই একই অঘটনের পুনরাবৃত্তি।

কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ফজল আবার উত্তেজনার কারণ হয়ে পড়লেন। ১৬ রানের মাথায় তিনি এল-বি-ডব্লু আউট হলেন। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে দেখাতে লাগলেন অসন্তোষ। প্যাভিলিয়েনে ফেরার পথে আবার শোনা গেল দর্শকের টিটকারি।

পাকিস্তান দল প্রায় দু'দিন ব্যাট করে মোট ৩৩৫ রান করে। দ্বিতীয় দিনে ভারতকে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্যে ব্যাট করতে দেওয়া হল। খেলা শেষের কয়েক মিনিট পর ফজল হঠাৎ ঠিক করলেন, পিচ দেখবেন। গ্রাউণ্ডসম্যানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পিচের উপর বসে দাগ কাটতে লাগলেন।

ঘটনা ভারতীয় খেলোয়াড়দের নজরেও পড়ল। কণ্ট্রাক্টার আম্পায়ারের কাছে আপত্তি জানালেন। আম্পায়ার ফজলকে বাধা দিলেন।

পরের দিন খবরের কাগজে এই ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। প্রায় পুরো দু'দিন ব্যাট করে এবং ১৫ মিনিট 'বোল' করে পাকিস্তান

দলের ক্যাপ্টেনের 'পিচ' পরিদর্শন কেন প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তা জাহাঙ্গীর খান নিজেও বুঝতে পারেননি।

খবরের কাগজের রিপোর্ট ফজল অস্বীকার করলেন। বললেন, তিনি পেন্সিল দিয়ে কোন দাগ দেননি। আরও বললেন, খেলার যে কোন সময় পিচ দেখতে যাওয়ার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক জাহাঙ্গীর খানকে জানান, ফজল যে পেন্সিল দিয়ে পিচে দাগ কেটেছেন, তা তাঁর কাছে আছে। পেন্সিলটির শিস ভাঙা এবং শিসের জায়গায় কাদা লেগে আছে।

কানপুরে ফজল, ইমতিয়াজ, এবং সুজাউদ্দিন আবার জাহাঙ্গীর খানের অনুমতি না নিয়ে এক ডিনার পার্টিতে চলে যান। তাঁদের পথ অনুসরণ করলেন, বুর্কি, সয়ীদ ও এজাজ। খেলার পর ফজলকেও হোটেলে পাওয়া যায় না। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর থেকে খেলা সম্পর্কে তাঁর কোন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই। রোজ সন্ধ্যেবেলা সেজেগুজে ফজল হাওয়া। ইমতিয়াজ, মামুদ হোসেন, সুজাউদ্দিন এবং সয়ীদেরও দেখা মেলে না। প্রবীণ খেলোয়াড়দের এই আচরণ নবীনদের মধ্যে সংক্রামিত হল। তাঁরাও বিনা অনুমতিতে যেখানে খুশী বেড়াতে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। প্রবীণ খেলোয়াড়দের গতিবিধি নিয়ে ম্যানেজারকে এইভাবে বিস্তর অসুবিধেয় পড়তে হয়।

জাহাঙ্গীর খান দলের সঙ্গে জামসেদপুর যেতে পারেননি। এইখানে আর একটি ছোট ঘটনা খেলোয়াড়দের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায়।

ফজল এবং ইমতিয়াজ বিশ্রাম নিতে চাইলেন। হানিফকে ঐ ম্যাচের জন্য ক্যাপ্টেন করা হল। এই নির্বাচনে বিরক্ত হলেন সুজাউদ্দিন। একজন 'জুনিয়ারের অধীনে খেলতে তিনি আপত্তি জানালেন। বললেন, হানিফকে ক্যাপ্টেন করলে তিনি খেলবেন না।

সমস্ত জটিল। শ্যাম, কূল দুই রাখতে ফজলের অনুরোধ শেষ পর্যন্ত ইমতিয়াজ হলেন ঐ ম্যাচের ক্যাপ্টেন।

কিন্তু তাহলে কী হবে, এই নূতন ব্যবস্থায় হানিফ আবার রেগে আগুন বাজে অছিলায় তিনি ফিল্ড করতে মাঠে নামলেনই না।

ফের কানপুরের কাহিনী। সেখানে স্থানীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশন পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের যাতায়াতের জন্যে বাস ছাড়া ফাউ হিসেবে একটি মোটর গাড়িও দিয়েছিলেন। এই গাড়িতে চড়লেন শুধু ফজল। তিনি দলের সঙ্গে বাসে উঠলেনই না।

কলকাতায় কিন্তু ফজলের অন্য রূপ। সেখানে সুজাউদ্দিনের এক বন্ধু তার হেপাজতে একখানা মোটরগাড়ি দিয়েছিলেন। সুজা ও মামুদকে ঐ গাড়ী চড়তে দেখে ফজল আপত্তি জানালেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সুজাউদ্দিন ক্যাপ্টেনের কোন কথাই শুনলেন না। বরং কানপুরের গাড়ি চড়ার কথা ফজলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বাঙ্গালোরের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। এক রাত্রে ফজল মদে চুর হয়ে হোটেলে ফিরলেন এবং নেশার ঝোঁকে নিজের ঘর থেকে ছুঁড়ে মারলেন এক টুল। টুল ভেঙে গেল। ফজল রাজি হলেন টুলের দাম দিতে।

এই ফজলামি-র ঘটনার পর হোটেলের ম্যানেজার বিল পেশ করতেই ফজলের অন্য মূর্তি। বলেন, টাকা দেব না, দাম বেশী ধরা হয়েছে।

হোটেলের ম্যানেজার ছুটে এলেন জাহাঙ্গীর খানের কাছে। তিনি তখন ফজলের হপ্তা-ভাতা থেকে টাকা কেটে দাম দিতে রাজি হলেন।

অবশ্যি স্থানীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশন নিজেরাই ঐ বিলের টাকা দিয়ে দিলেন। ফজলকে কিছুই দিতে হল না।

এবারে দিল্লি টেস্ট। রোশানারা ক্লাব পাকিস্তানী দলের

সম্মানে ডিনার ও ডান্সের আয়োজন করেন। ঠিক হয়, দলের সবাই রাত সাড়ে দশটায় পার্টি ছেড়ে চলে আসবেন। কিন্তু ঠিক করাই সার,—ফজল, হানিফ, আলিম এবং গণি বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও থেকে গেলেন পার্টিতে। ইমতিয়াজ, সুজা, মামুদ এবং সয়ীদ পার্টি ছেড়ে অন্য কোথাও হাওয়া। বিরক্ত জাহাঙ্গীর খান দলের অন্য সবাইকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলেন।

দিল্লি টেস্টে উপস্থিত থাকার জন্যে ভারত সরকার পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহবিবুর রহমানকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শ্রীরহমান তদনুযায়ী দিল্লিতে এসেছিলেন। ঐ সময় জনৈক ভারতীয় কূট-নীতিবিদ্ শ্রী রহমানকে জানান, ফজল অন্য এক পার্টিতে রাত আড়াইটা পর্যন্ত প্রচুর মদ খেয়েছেন।

শ্রী রহমান এই সংবাদে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। তিনি জাহাঙ্গীর খানকে পরদিন ডাকলেন। জাহাঙ্গীর খান সোজাসুজি বলে দেন, ফজল সফরের আগাগোড়া এইভাবে দুর্ব্যবহার করে চলেছেন।

দিল্লি টেস্টের শেষদিন ভারতের ক্রিকেট কণ্টোল বোর্ড আশোক হোটেলে এক বিদায়ভোজের ব্যবস্থা করেন। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এবং দেশী বিদেশী আরও অনেক গণ্যমান্য ঐ আসরে উপস্থিত ছিলেন।

সফরের আগাগোড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর খানই প্রয়োজনমত দলের হয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। একটি কি দুটি ক্ষেত্রে দিয়েছেন ফজল। অশোক হোটেলের বিদায়-ভোজে ফজল জাহাঙ্গীর খানকে বললেন, তিনিও এই আসরে কিছু বলতে চান।

জাহাঙ্গীর খান আপত্তি করেননি। শুধু বলছেন, ফজল যেন বিতর্কমূলক কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন।

ফজল বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। জাহাঙ্গীর খান দেখেন, কী আশ্চর্য, ফজল ভারতীয় ক্রিকেট কণ্টোল বোর্ড, আম্পায়ার, বেতার-

ভাষ্যকার, আকাশবাণী, ভারতীয় সংবাদপত্র সবাইকে গালমন্দ শুরু করেছেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই আসরের বিবরণ কোন সংবাদপত্রে বেরোয়নি। জাহাঙ্গীর খান হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

পুণায় এক পিকনিক নিয়েও কম গণ্ডগোল হয়নি। ঠিক হল কোন এক ছুটির দিনে দলের সবাই পিকনিক করতে যাবেন। স্থানীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশন একটি বাস ও মধ্যাহ্নভোজনের ভার নিলেন। পিকনিকে রওনা হবার ঠিক আগে, চারজন ছাড়া ইমতিয়াজ ও সুজার নেতৃত্বে আর সবাই বেঁকে বসলেন। তাঁরা পিকনিকে যাবেন না। যাবেন সিনেমা দেখতে। ম্যানেজার জাহাংগীর খান এবং স্থানীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশন উভয়ে পড়লেন বিচ্ছিরি অবস্থার মুখে।

আর একটি ঘটনা। দল যখন কলকাতায়, উর্দু ভাষার সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত এক মুশায়ারায় যোগ দেবার জন্যে হায়দ্রাবাদ থেকে নিমন্ত্রণও এল। হায়দ্রাবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদকও সুপারিশ করলেন।

জাহাংগীর খান দলের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সবাই মুশায়ারায় উপস্থিত থাকতে রাজি। সকলের সম্মতি নিয়েই জাহাংগীর খান এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু হায়দ্রাবাদে পৌঁছে দেখা যায়, অনুষ্ঠানের দিন ইমতিয়াজ এবং সুজা স্থানীয় এক শেঠের যোগসাজসে অন্য এক গানের আসরে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা তুজন মুশায়ারায় যেতে একেবারেই গররাজি। কী ব্যাপার? ম্যানেজারের প্রশ্নের উত্তরে ইমতিয়াজ, সুজা তুজনেই বলেন, তাঁরা মুশায়ারায় উপস্থিত থাকবেন, এমন কথা কাউকে দেননি। জাহাঙ্গীর খান অবাক।

হানিফ মহম্মদের খ্যাতি জগৎজোড়া। সফরে তাঁকে নিয়ে জাহাঙ্গীর খানের কম তুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। হানিফ ছোটদের

সঙ্গে বেশ হাসিখুশী থাকেন, কিন্তু বড়দের দলে তাঁর ভীষণ অসোয়াস্তি। অনেক 'সিনিয়র' খেলোয়াড়ের সঙ্গে হানিফের বাক্যালাপ পর্যন্ত ছিল না। তিনি তাঁদের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে চাননি, এক কামরায় ভ্রমণ করতেও ছিলেন অনিচ্ছুক। বেড়াতে বেরোলে কিংবা হোটলে থাকার বেলায় সবচেয়ে আগে তাঁর ব্যবস্থা করতে হত। নইলে চটে যেতেন।

প্রবাদবাক্যের 'লেট্ লতিফের' মত হানিফও বারবার লেট। 'লেট-হানিফকে' নিয়ে ম্যানেজারের ভীষণ যন্ত্রণা। কোথাও কোন সরকারী অনুষ্ঠানে বেরোবার সময় বা খেলায় নামবার আগে হানিফের তৈরী হতে হতে দেরি হয়ে যেত। তাঁকে তুলে আনার জন্যে বারবার পাঠাতে হয়েছে অন্য লোক। হানিফের এই শম্বুক-আচরণ দলের অন্যান্য সকলের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের ধারণা হয়, অকারণে হানিফকে আশ্‌করা দেওয়া হচ্ছে। মাদ্রাজ এবং দিল্লি টেস্টের সময় বিলম্বের জন্যে প্রায়ই হানিফকে হোটেলে ফেলে যেতে হয়েছে। পরে শেষে মুহূর্তে ট্যাক্সি ডেকে হানিফ হাজির হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি-ভবনে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের দেওয়া সম্বর্ধনানুষ্ঠানেও হানিফকে বিলম্বের জন্যে হোটেলে ফেলে দলকে চলে যেতে হয়। পাক ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হোসেন তখন দিল্লিতে। তিনি ট্যাক্সি ডেকে হানিফকে রাষ্ট্রপতি-ভবনে পৌঁছে দেন।

শুধু তাই নয়, অনেক সময় কোন কারণ না দেখিয়েই হানিফ সরকারী অনুষ্ঠানে যোগ দেন নি। তাঁর অনুপস্থিতি দলের অস্বস্তি ও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ম্যানেজার যখনই এই সব ব্যাপারে একটু কড়া কথা বলেছেন, তখনই হানিফ বলেছেন,—'ঠিক আছে, আমায় পাঠিয়ে দিন পাকিস্তানে। আমি খেলব না।'

মোট্ কথা, সফরের আগাগোড়া 'পেশাদার' হানিফের আদত

কথা ছিল যে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে পেশাদার খেলোয়াড়ের ফি দেন নি।

বোম্বাই শহরে ট্রাঙ্ক-কল নিয়ে দেখা দিল নতুন ঝামেলা। হানিফ করাচীতে এক ট্রাঙ্ক-কল 'বুক' করলেন। বিলের টাকা দিতে তিনি নারাজ। তাঁর মতে এই টাকা দিতে হবে ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে। জাহাঙ্গীর খান বললেন,—না, তা হবে না, ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে এমন কোন শর্ত নেই। টাকা দিতে হবে হানিফকেই।

কানপুরে ঠিক আবার তাই। জাহাঙ্গীর খান রেগেমেগে হানিফের হপ্তা-ভাতা থেকে ট্রাঙ্ক-কলের টাকা কেটে নিলেন।

বাঙ্গালোর। করাচী থেকে সুসংবাদ এল, হানিফের এক ছেলে হয়েছে। হানিফ আনন্দে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মদের আসর বসালেন। ঐদিনই করাচীতে 'বুক' করলেন দুটি ট্রাঙ্ক-কল। এবং সে-ই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হানিফ বিলের টাকা দেবেন না। ভারতীয় বোর্ডের সহ-সম্পাদক জাহাঙ্গীর খানকে বিষয়টি জানালেন। জাহাঙ্গীর খান ক্ষমা চেয়ে বললেন, হানিফের হপ্তা-ভাতা থেকে বিলের টাকা তিনি কেটে নেবেন।

শেষ পর্যন্ত ঐ টাকা অবশ্যি দিয়ে দেন স্থানীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

হানিফ যখন পাকিস্তান থেকে এলেন তখন তাঁর দুই গোড়ালিতেই ব্যথা। কোন ট্রায়াল খেলায় তিনি যোগ দেন নি। তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে এলেনই দেরীতে। তারপর লাহোরে একদিন থেকেই স্ত্রীর অসুখের দোহাই পেড়ে সোজা করাচী। পুণায় ভারত সফরের প্রথম খেলায়ই তিনি ডান গোড়ালির যন্ত্রণার কথা বললেন। বরোদায় দ্বিতীয় খেলায় তিনি যোগ দিলেন না। তাঁকে চিকিৎসার জন্যে বোম্বাই পাঠানো হল।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা সুরু হওয়ার আগে হানিফ স্মরণ করিয়ে

দিলেন তিনি পেশাদার খেলোয়াড়, এবং ক্রিকেট খেলেই তাঁর পরিবার চলে। পাক ক্রিকেট বোর্ড তাঁর পেশাদারী-ফী দেন নি। হানিফের অভিমত ঃ—অসুস্থ থাকলে খেলতেই হবে, এমন কোন শর্ত তাঁর চুক্তিপত্রে নেই। তাই যখন শরীর ভাল থাকবে, তখনই তিনি খেলবেন।

নিজের খেলা সম্পর্কে হানিফের জ্ঞান টনটনে। হানিফ মনে করেন ব্যাটিংয়ে পুরো দলের অর্ধেকের বেশী তিনি একাই। অর্থাৎ একাই একশ'। তাই তার সুযোগও নিতে চেয়েছেন সব সময়।

বোম্বাই টেস্টে হানিফকে খেলবার জন্যে জাহাঙ্গীর খানকে কম বেগ পেতে হয় নি। কাকুতিমিনিতি, অনুরোধ-উপরোধ সব কিছু। অনেক কষ্টে রাজী করানোর পর হানিফ তুললেন নূতন বায়না। তিনি ওপেনার হিসেবে ব্যাট করতে নামবেন না। তাঁর বদলে ঐ জায়গায় নামুক আলিমুদ্দীন। বুর্কিকে দলে নিতেও হানিফের অমত। বুর্কি নাকি পাকিস্তানে এমন কিছু ভাল খেলেন নি যাতে তাঁকে দলে নেওয়া যেতে পারে।

বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্ট ম্যাচে হাসিব হাসানের ঘটনায়ও হানিফের হাত আছে। হাসিব বল করছেন। আম্পায়ার হাঁকলেন—'নো-বল।' হাসিব আপত্তি জানিয়ে বললেন—কেন 'নো-বল ?'

আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় যখন ব্যস্ত, হানিফ ছুটে এলেন। চোখ পাকিয়ে আম্পায়ারকে বলতে লাগলেন, মিড-অফ থেকে দাঁড়িয়ে সব দেখেছেন, এবং তিনি নিশ্চিত যে, হাসিবের 'নো-বল' হয়নি। এই কথা কাটাকাটি মাঠে এক বিচ্ছিরি অবস্থার সৃষ্টি করল।

দর্শককুল যথারীতি বিড়াল-ডাকে পাকিস্তানী দলকে টিটকারি দিতে লাগল।

তাছাড়া সুরার প্লাবনে এবং নারী-সঙ্গ কামনায় ভারত সফরকারী

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় প্রচুর উন্মত্ততা দেখিয়েছেন।

ভারত সফরের শেষ খেলায় দল যখন বোম্বাইতে, ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জাহাঙ্গীর খানকে তিনটি বিষয়ে রিপোর্ট করেন। এই তিন রিপোর্টই পাকিস্তানী দলের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর।

প্রথম রিপোর্টের বক্তব্য: প্রথম টেস্ট ম্যাচের পর সি সি আইয়ে হানিফকে তাঁর গোড়ালির চিকিৎসার জন্যে থাকতে দেওয়া হয়।

একদিনের ঘটনা। রাত তখন ১১টা। হঠাৎ হানিফের ঘরে শোনা যায়, নারীকণ্ঠের কাকলি। কী ব্যাপার? হানিফ এক মেয়ে নিয়ে মেতেছেন।

সি সি আই অফিস তাতে আপত্তি জানালেন। বললেন, মেয়ে নিয়ে বেলেল্লাপনা এখানে চলবে না।

হানিফ নাছোড়বান্দা। তিনি নারীসঙ্গ ছাড়তে নারাজ। ফোন করলেন ক্লাবের সেক্রেটারীকে। সেক্রেটারী পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন ক্লাবে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করা চলবে না।

হানিফ অগত্যা ক্লাব ছাড়লেন। মেয়েটিকে নিয়ে উঠলেন অন্য জায়গায়। তারপর তিন রাত অন্যত্র অভিসার। যদিও সরকারীভাবে তিনি ম্যানেজারকে জানান, ক্লাবেই আছেন।

দ্বিতীয় রিপোর্ট ফজলের বিরুদ্ধে। অমরনাথের সাহায্যে ম্যাচ খেলার সময় তিনি একজন লোক ও একটি মেয়েকে নিয়ে ক্লাবে ফিরলেন শেষরাতে। প্রায় ৩টায়। ক্লাবের একজন কর্মচারী জানালেন রাত ১১টার পর কেউ কোন অতিথিকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে পারেন না। নিয়ম নেই।

ফজল রেগে কাঁই। ক্লাবের কর্মচারীকে এই মারেন তো সেই মারেন। অকথ্য গালাগালিও চলল। ক্লাবের সেক্রেটারী ফোনে জাহাঙ্গীর খানকে ঘটনাটি জানালেন। জাহাঙ্গীর খান ফজলকে

ডেকে বললেন, ওসব চলবে না, সি সি আই পাবলিক হোটেল নয়। অতিথি হিসেবে পাকিস্তানী দলের সকলের উচিত, ক্লাবের আইনকানুন মেনে চলা।

ফজল পাল্টা জানান, ক্লাবের ঐ কর্মচারীর ব্যবহার অপমান-জনক। তাঁর সঙ্গের দু'জন এক দম্পতি। তিনি তাঁদের কিছু উপহার দিতে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিলেন।

ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্রী এ এ যশদানওয়ালা জাহাঙ্গীর খানের কাছে হানিফ ও ফজলের আচরণ নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, ঝামেলা না বাড়ানোর জন্যে হানিফের প্রসঙ্গ তিনি গোপন রেখেছেন, ক্লাবের সভাপতি সার হোমী মোদী ছাড়া আর কাউকে কিছু বলেন নি।

মেয়ে নিয়ে হানিফের ঢলাঢলি জাহাঙ্গীর খান আগেও লক্ষ্য করেছেন। পশ্চিম ভারতে সফরের সময় হানিফ নিজের ঘরে মেয়েদের আপ্যায়িত করেছেন এবং হৈ-হুল্লোড়ে প্রমোদের হাট বসিয়েছেন। যখনই প্রশ্ন করা হয়েছে, হানিফ বলেছেন, উনি আমার আত্মীয়, ইনি আমার স্ত্রীর আত্মীয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপরেও দেখা গেছে, হানিফ একজন না একজন মেয়ে নিয়েই আছেন। নারীসঙ্গ ছাড়া হানিফকে কদাচিৎ দেখা যেত।

তৃতীয় রিপোর্ট আরও সাঙ্ঘাতিক। গনি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সফরের আগাগোড়া গনি যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে গেছেন। তিনি এমনতিই অত্যধিক সুরাসক্ত।

অমরনাথের সাহায্যদান খেলার সময় এক সন্ধ্যায় গনি আরও কয়েকজনের সঙ্গে এক ডিনার পার্টিতে যান। পার্টির উদ্যোক্তা এক খ্যাতনামা চিত্রতারকা। সেই আসরে গনি এত মদ খেলেন যে, কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই একেবারে বে-হেড। তারপর মাতলামির চূড়ান্ত। তাঁকে আসর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

ফেরার পথে আরও ন্যক্কারজনক কাণ্ড। রাস্তায় এক ভিখিরি

বালককে নিয়ে উঠলেন নিজের ঘরে। ক্লাবের চাকরবাকরের নজরে পড়ল। তারা ছুটে গিয়ে ঐ বালককে গনির ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে এল।

লজ্জাজনক কাজের শেষ এখানেই নয়। সেদিনই মাঝরাতে ২-১৫ মিনিটে ক্লাবের সেক্রেটারী জাহাঙ্গীর খানকে টেলিফোন করে জানালেন, গনির ঘরে একটি বাজে মেয়ে রয়েছে। ক্লাবের কর্মচারীদের আপত্তি সত্ত্বেও গনি মেয়েটিকে কিছুতেই ছাড়ছেন না। ক্লাবের সেক্রেটারী জাহাঙ্গীর খানের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন।

জাহাঙ্গীর খান গনিকে টেলিফোন করলেন। কিন্তু লালসা-উন্মাদ গনির তখন রিসিভার তোলার মত অবস্থা নয়। ক্রিং ক্রিং টেলিফোন বেজেই চলল।

শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর খান লজ্জায় ক্ষোভে ছুটে এলেন ক্লাবে। গনিকে ধমক দিয়ে বললেন—"একুখুনি দূর কর মেয়েটিকে!"

পরদিন সকাল। গনি এলেন জাহাঙ্গীর খানের কাছে। বললেন, সেই মেয়েটি তাঁর আত্মীয়। তিনি তাঁকে 'শেহরি'তে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীর খান বললেন, মেয়েটি গনির ঘরে এসেছে রাত সওয়া দুটোয় এবং পৌনে পাঁচটায় শেহরির সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

গনি স্পীকৃটি নট্। কাঁচুমাচু মুখে হাতজোড় করে বললেন —'স্যার' মাফ্ কিজিয়ে।'

চুক্তিমত ভ্রমণকালে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ফজল মামুদ হানিফ এবং গনির মদ ছাড়া চলে না। তাঁরা মদ খাওয়া বাদও দেন নি। তবে ফজল আর গনি মোটামুটি জাহাঙ্গীর খানের অজ্ঞাতেই গেলাস হাতে নিতেন; কিন্তু হানিফ এক কাঠি বাড়া। তিনি নিঃসঙ্কোচে সবার সামনে মদ খেয়েই চলতেন। দলের অন্যান্যরাও খেতেন, তবে যথাসম্ভব আড়ালে।

মাদ্রাজ "নির্মদ" রাজ্য। ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদে যাকে

বলে "শুল্ক"। দল যখন কলকাতায়, মদের জন্য কোন খেলোয়াড়ের কতখানি পারমিট দরকার জানিয়ে দেবার অনুরোধ মাদ্রাজ থেকে আসে। জাহাঙ্গীর খান জানান, পারমিটের কোন দরকার নেই।

কিন্তু মাদ্রাজ রওনা হবার আগে কলকাতায় স্থানীয় ম্যানেজার জাহাঙ্গীর খানকে বলেন, দলের কয়েকজন খেলোয়াড় মদের পারমিটের জন্যে তাঁর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন এবং তদনুযায়ী তিনি ব্যবস্থাও করেছেন।

জাহাঙ্গীর খানের অনুরোধে স্থানীয় ম্যানেজার পারমিট প্রার্থীর তালিকাটি দেখান। তাতে লেখা আছে হাসিব-হাসান, গনি, মুনাফ, আলিম এবং হানিফের নাম।

হানিফই শুধু নয়, মামুদ হোসেন এবং সয়ীদ আহমেদও জাহাঙ্গীর খানকে সারা সফর উত্ত্যক্ত করেছেন। মামুদ হোসেন ঠিক বুঝতে পারেন না স্পষ্টবাদিতা এবং অন্যকে আঘাত করার মধ্যে তফাৎ কোথায়। স্পষ্টবাদীর মুখোশ পরে তিনি বার বার দলের অন্যান্য সদস্যকে আঘাত দিয়ে গেছেন। সফর শুরু হবার আগে থেকেই হানিফের সঙ্গে মামুদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়! সফরের সময় উভয়ের মধ্যে প্রায়ই কথাকাটাকাটি, বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে।

জাহাঙ্গীর খান এই তিক্ত সম্পর্কের ব্যাপারে মামুদের সঙ্গে কথা বলেন। মামুদ তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের কথা পাড়লেন। সেই সফরে পাকিস্তানী দলের ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর কী রকম কথাবার্তা হয়, তাও ব্যাখ্যা করলেন। অর্থাৎ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, কারও কথা শোনার পাত্র তিনি নন।

হানিফের মত সয়ীদও নারীসঙ্গবিলাসের জন্য পাগল এবং সন্ধ্যের পর প্রায়ই তাঁর পাত্তা পাওয়া যেত না।

একদিন হানিফ মামুদ হোসেন এবং সয়ীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ পেশ করেন। সয়ীদ এই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ম্যানেজারকে জানানোর কোন প্রয়োজনই মনে করেননি।

ভারতের আম্পায়ারদের কাজ নিয়েও এই সফরে কম সোরগোল ওঠে নি। জাহাঙ্গীর খান মনে করেন, সামগ্রিকভাবে আম্পায়ারিংয়ের মান নীচু এবং কলকাতা ও কানপুরের টেস্ট ম্যাচে পক্ষপাতিত্ব ছিল।

জাহাঙ্গীর খান নিজে দেখেছেন, কানপুরে ভারতের প্রথম ইনিংসের প্রথম ওভারে কন্ট্রাক্টর মামুদ হোসেনের বলে উইকেট কীপারের হাতে ক্যাচ আউট হয়েছেন। কিন্তু আম্পায়ার কন্টাক্টরকে আউট দেননি। লাহোরের এম-এ-ও কলেজের অধ্যক্ষ দিলওয়ার হোসেন এবং জাহাঙ্গীর খান পাশাপাশি বসেছিলেন। ব্যাটসম্যানদের ঠিক পেছনে। খালি চোখেই বলটা তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন।

পরে জাহাঙ্গীর খান আরও শুনেছেন যে, ৯৫ রানের মাথায় উমরিগর উইকেট কীপারের হাতে ক্যাচ আউট হন, কিন্তু তাঁকেও আউট দেওয়া হয়নি।

এবারে কলকাতা টেস্ট। সেই বহু-বিতর্কমূলক প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি। জাহাঙ্গীর খানের মতে বৃষ্টির পর খেলা শুরু করার ব্যাপারে বিলম্ব ঘটিয়ে দেওয়া একেবারেই অহেতুক ছিল। তার ফলে 'তাজা উইকেটে' বল করার সুযোগ থেকে পাকিস্তান বঞ্চিত হয়।

শুধু তাই নয় পুণার একটি খেলায় হানিফ পাঁচ রানের মাথায় উইকেট কীপারের হাতে ক্যাচ আউট হন। কিন্তু তাকে আম্পয়ার আউট দেন নি। হানিফ শেষ পর্যন্ত রান করলেন ২২০।

ব্যক্তিগত আলাপের সময় যখনই পাকিস্তানী খেলোয়াড়রা ভারতীয় আম্পায়ারদের খুঁৎ ধরেছেন, তখন ভারতীয় খেলেয়াড়দের কয়েকজন তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, ১৯৫২-৫৩ সনে ভারতের পাকিস্তান সফরকালীন ইদ্রিস বেগের আম্পায়ারিংয়ের মত এবারের আম্পায়ারিং ততটা খারাপ নয়।

পাকিস্তানী প্রেস রিপোর্টারদের সম্পর্কেও অনেক কিছু বলা যায়। এদের স্বভাবই ছিল খুঁৎখুঁতে। তাঁরা সকলের আগাগোড়া

বিভিন্ন ব্যবস্থার খুঁৎ ধরে গেছেন। এইটেই যেন ছিল তাঁদের একমাত্র কাজ।

পাকিস্তানের প্রেস রিপোর্টারদের নিয়ে জাহাঙ্গীর খান নিজে কম জ্বালাতন হন নি। খেলার শুরু হবার আগে ও বিরতির সময় এঁরা ঢুকে যেতেন ড্রেসিং রুমে এবং বাইরে কী সমালোচনা শুনে এসেছেন, তাই পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে যেতেন। ফলে খেলোয়াড়রা 'নার্ভাস' হয়ে পড়তেন। এমন কি ঐ রিপোর্টারদের দল ড্রেসিং রুমে বসেই তাঁদের রিপোর্ট টাইপ করতেন।

এঁরা আবার চাইতেন, খেলোয়াড়রা যা সুবিধে পান, তা তাঁদেরও দেওয়া হোক। এমন কি পাকিস্তানী রিপোর্টাররা স্থানীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে বলতেন "আমাদের থাকার জায়গা করা হয় নি কেন ?" "ট্রেনে আমাদের বার্থ রিজার্ভ করে দিন " ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি স্থানীয় কর্মকর্তাদের করার কথা নয়। তদুপরি রিপোর্টারদের অধিকাংশই সুরাসক্ত।

ফজল, ইমতিয়াজ, হানিফ, মামুদ হোসেন, সুজাউদ্দীন, সয়ীদ এবং গনিকে জাহাঙ্গীর খান আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁদের আচরণে পাকিস্তানের মর্যাদা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এঁরা সবাই প্রবীণ খেলোয়াড়, খ্যাতিমানও। বিদেশে সফর করেছেন অনেকবার এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফজল, হানিফ, ইমতিয়াজ কেউই জাহাঙ্গীর খানের কথা শোনেন নি। তাঁদের ধারণা হয় যে, তাঁরা যা খুশী দুর্ব্যবহার করতে পারেন এবং সফর শেষে এর জন্যে কোন শাস্তিই পেতে হবে না।

কাহিনীর আর একটু পুনশ্চ সমাচার আছে। ফজল-হানিফের ধারণা ঠিক নয়। অশোভন আচরণের জন্য ওদের দুজনেরই সাজা হয়েছে, পাকিস্তানের ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়।

টলিউডের রাজকুমার

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের চৌদ্দ নম্বর বাড়ীটাতে ঢুকতে গিয়ে কিছুটা ভয় ভয় করছিল। বাড়িখানা পেল্লাই। চেহারায় বিপুলা, কিন্তু গতযৌবনা। পলেস্তারা খসবো-খসবো করছে। আগাছাও আসকারা পাচ্ছে চত্বরে, ফটকে। আছে আর সব, নেই ছিরি-ছাঁদ। কেমন যেন গা ছম-ছম ভাব।

তাছাড়া বাড়ির মালিককে নিয়েও দুশ্চিন্তা ছিল। অনেক-দিনের সাধ তাঁর সঙ্গে দু-চার কথা বলব, আধঘণ্টা সময় আদায় করেছি চেষ্টা-চরিত্তির করে, এখন ভাবনা, 'সাহেবের' মেজাজ শরিফ তো? নাকি 'মোলাকাত নেহি মাঙতা' বলে হাঁকিয়ে দেবেন দূর থেকে?

তবে একমেব ভরসা পূর্ব পরিচয়ের সামান্য সম্বল। এসেছিও শান্তিনিকেতনী সূত্রে, তাঁর দুজন নিকট আত্মীয়ের মারফতে। এবং বিস্ময়ের কথা, গৌরীপুরের রাজকুমার স্টুডিয়ো ফ্লোরের 'বড়ুয়া সাহেব' আমার প্রস্তাবে গররাজি হন নি।

বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার কথা বলছি—আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে যিনি ছিলেন ভারতীয় সিনেমা জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। ব্যক্তিত্বে, আভিজাত্যে অতুলনীয় কৃতি পুরুষ।

রাজার ঘরের ছেলে, আমাদের কৈশোরে রূপকথার রাজকুমারও তিনি। ঘরে ঘরে, মুখে মুখে ফিরত তাঁর নাম। সেকালের সিনেমা-পাগল যুব সমাজের তিনি আদর্শ, তরুণীকুলের নিশা-স্বপ্ন। মুক্তি, দেবদাস, রজত-জয়ন্তী, উত্তরায়ণ, শেষ উত্তর ইত্যাদি মোড়-ফেরানো ছবি এবং তার নায়ক ও পরিচালকের কথা কে ভুলবে?

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। ড্রয়িং রুম অতিকায়, চারধারে নানা রকম মৃগয়ার স্মৃতি। ঘরে কেমন যেন দম আটক্যানো ভাব, সুদৃশ্য ও মূল্যবান আসবাব দেখে ঠাহর হয় একদিন তাদেরও চেক্‌নাই ছিল। ছিল নয়ন মন হরণের জাদু।

উর্দিপরা এক বেয়ারা এসে পাখা খুলে দিলে। নাম টুকে নিলে। আবার নির্জন দ্বীপে ফেলে আসা নাবিকের মত আমায় একলা রেখে সে উধাও।

আমি অধীর অপেক্ষায় ক্ষণ গুণছি এবং ভাবছি বছর দুই আগেকার কথা।

১৯৪৩ সাল। আমি তখন পড়ি স্কুলে। আমার মামাবাড়ি সিলেটের পাড়াগাঁ শ্রীগৌরীতে। বোধহয় ক্লাশ এইট নাইন হবে। নিগু´ম্ফ হাফ প্যান্টের কাল চলছে। থাকিও দূরে, কিন্তু সমবয়সী আর পাঁচটা ছেলের মতই টালিগঞ্জের সিনেমা স্টুডিয়োগুলো মনে মায়াজাল গাঁথতে শুরু করে দিয়েছে। দাদামশায় দিদিমার কড়া চোখ এড়িয়ে দু-চারটে সিনেমাও দেখে ফেলেছি। তদুপরি তার-কাদের নাম-ধাম, তাঁদের সব খুঁটিনাটি খবর ঠোঁটস্থ। যতটা জানি, কৌতূহল তার চেয়ে বেশী। এবং এই জগতের মধ্যমণি আমাদের কাছে প্রমথেশ বড়ুয়া। তিনি তখন খ্যাতির শিখরে।

এমন সময় হঠাৎ যেন কার কাছ থেকে বড়ুয়া সাহেবের কলকাতার ঠিকানা পেয়ে গেলুম। '১৪নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড' ঠিকানা তো নয়, যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, ভোজবাজের জাদুকাঠি। অনেক মুসাবিদা করে একদিন একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলুম ওই ঠিকানায়। চিঠির বক্তব্য হাস্যকর। 'মহাশয়, আমি অমুক, বড় গরীব। বিপদে পড়েছি। সিনেমায় নামতে চাই। চাকরের পার্ট দিলেও ভি আচ্ছা। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করেন,' ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনিয়ে বিনিয়ে সাতকাণ্ডী রামায়ণ।

দিন যায়, হপ্তা যায়, চিঠির জবাব আসে না। শেষমেষ আশা

ছেড়েই দিলুম। কিন্তু একদিন ডাকঘরে গিয়ে হাতে পেয়ে গেলুম সাত রাজার ধন এক মাণিক। প্রমথেশ বড়ুয়ার জবাব এসে গেছে। এবং কী অদ্ভুত, কী আশ্চর্য, একেবারে তাঁর নিজের হাতে লেখা চিঠি। আমি আনন্দে প্রায় লাফ দিয়ে ফেলেছিলুম আর কি।

চিঠির বক্তব্য নেতিবাচক। তা হোক, আমি তো আর সত্যি সত্যি সিনেমায় নামতে চাই নি। আমার উদ্দেশ্য ছিল সিনেমায় পার্ট করে যিনি নাম কিনেছেন, তার একখানি হাতে লেখা চিঠি পাওয়া এবং তারই জোরে সহপাঠীদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। সে আমি পেয়ে গেছি। আমাকে আর পায় কে।

চিঠিখানার ভাষা কিন্তু বড় মনোরম। পড়ে মন জুড়িয়ে গেল। তিনি লিখেছেন—

প্রীতিভাজনেষু, আপনার চিঠির প্রাপ্তি-সংবাদ জানাচ্ছি। আমার নতুন ছবির জন্য লোক অনেকদিন আগেই নিয়েছি, এখন আর লোকের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আপনি এখন ছেলেমানুষ, আমার মনে হয় চেষ্টা করে পড়াশুনা কন্‌টিনিউ করাই ভাল। আপনি যে ধরনের কাজ চেয়েছেন, সেই রকম কাজ করবার লোক নতুন বইতে নেই। যদি ভবিষ্যতে দরকার হয় খবর দেবো।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রমথেশ বড়ুয়া

কলকাতা, ১৮ই জুলাই'৪৩

যতদূর মনে পড়ে, প্রমথেশ বড়ুয়া সে সময় 'মায়ের প্রাণ' বই শেষ করে 'চাঁদের কলঙ্ক' নামে আর একটি ছবিতে হাত দিয়েছেন। চিঠিতে যে নতুন বইয়ের কথা লেখা, সেটা সম্ভবত ওই 'চাঁদের কলঙ্ক'ই।

তা যাই হোক, ইতিমধ্যে ইস্কুলে, গাঁয়ে আমার কদর বেড়ে গেছে। চিঠি আমার পকেটে পকেটে ঘোরে, সুযোগ না পেলে হেনতেন পাঁচকথা পেড়ে পকেটে হাত দিই এবং অমূল্য চিঠিখানা

বের করে ফেলি।—যে-পড়ে, সে-ই অবাক হয়।—'প্রমথেশ বড়ুয়ার নিজের হাতের লেখা, এ্যাঃ!' সহপাঠী বন্ধুরা তো টানাটানি করে চিঠিখানা ছিঁড়েই ফেলে আর কি!

কিছুদিন পর ম্যাট্রিক পাশ করে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হলুম। সেখানে প্রমথেশ বড়ুয়ার কয়েকজন আত্মীয়ও পড়তেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এবং অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে একদিন কলকাতায় ১৪নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে চলে এলুম।

বড়ুয়া সাহেব তখন ফিল্ম লাইন থেকে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে এনেছেন। বোধহয় তখন হিন্দি ছবি 'আমীরি' তোলা হয়ে গেছে। বাইরে বিশেষ বেরোন না, আপন মনেই আত্মগোপন করে থাকেন।

আমার ভাবনার মাঝখানে ছেদ পড়ল। গৃহকর্তা স্বয়ং হাজির। পায়ে চটি, গায়ে ঢাউস ড্রেসিং গাউন, হাতে বই। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ।

উঠে দাঁড়াতেই ম্লান হেসে বললেন, 'বসুন, আই মীন বসো।'

পাশের সোফায় তিনিও বসলেন। খানিক বিরতি। তারপর খানিকটা উদাস সুরে বললেন, 'কী করা হয়?'

'ফার্স্ট ইআরের ছাত্র, শান্তিনিকেতনের কলেজে' জবাব দিলুম।

'ও, তাই নাকি' নিস্পৃহ উত্তর।

আবার চুপচাপ। আবার সূচীপতন নৈঃশব্দ্য। ইতিমধ্যে বেয়ারা রেকাবীতে দুটি রসগোল্লা, এক গ্লাস জল এবং দু কাপ চা দিয়ে গেছে।

এবারে আমার প্রশ্নের পালা। 'আপনি আর ছবি তোলেন না কেন?'

'ভাল লাগে না। মুড পাই না।'

'কোন বিশেষ ছবি তোলার সাধ ছিল?'

'বিশেষ ছবি!' তিনি হাসলেন, 'বিশেষ ছবি বলতে কী

বোঝাতে চাইছ জানিনে, তবে বিশেষ না হলে আমি কোনদিন কোন ছবিতেই হাত দিই নি।'

'আমি অনেক সময় মনে মনে ভেবেছি' সসংকোচে বলি, 'আপনি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ছবি করছেন এবং নিজে পার্ট নিয়েছেন অমিত রায়ের।'

আমার কথা শুনে প্রমথেশ বড়ুয়া হো-হো হেসে উঠলেন। তারপর হাসির রেশ মুখে রেখেই বললেন, 'অমিত রায়ের ভূমিকা নিলে বুঝি আমাকে মানাত?'

'বোধহয়'—আমার উত্তর।

'না, 'শেষের কবিতা' নয়', বড়ুয়া সাহেব ধীরে গলা চড়িয়ে বলে চললেন, 'ভেবেছিলুম 'ঘরে বাইরে' পর্দায় নামাব। অনেক-দিনের সাধ ছিল আমার। কিন্তু পারলুম না। বোধহয় আর পারবও না।'

গলায় নৈরাশ্যের সুর। হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে একটু থেমে বললেন 'তুমি তো শান্তিনিকেতনের ছাত্র। গান জান, রবীন্দ্র সংগীত?'

বললুম, 'ভালবাসি, কিন্তু আমি যে অ-সুর। সুর বুকে ঠিকই আছে, কিন্তু গলায় এসে আটকে যায়।'

'আমিও ভালবাসি এবং জানো না বোধহয়,' তিনি বলেন, 'আমিই প্রথম সিনেমাতে রবীন্দ্র সঙ্গীত চালাই। 'মুক্তি'তে। অনেকে আপত্তি করেছিলেন, শুনি নি। লোকেও নিয়েছে।'

তারপর চলল কথার পিঠে কথা। রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে সায়গল। সায়গল থেকে নিউ থিয়েটার্সের সেই আদিযুগের কথা, বীরেন সরকারের কথা। অনেক কিছু।

আবার স্তব্ধতা। তখন একফাঁকে সেই চিঠিখানা বের করে বললুম, 'চিনতে পারেন?'

প্রমথেশ বড়ুয়া পড়লেন। পড়ে বললেন, 'কাকে লেখা?

তোমাকে ? ও তাই নাকি। আমি ভুলেই গেছি। তা সিনেমায় নামতে চেয়েছিলে কেন ?'

'নামতে মোটেই চাই নি,' আমার জবাব, 'আসলে আপনার হাতে লেখা চিঠি পাওয়ার দিকেই ছিল লোভ। আপনি রাজী হলেও আমি নারাজ হতুম।'

প্রমথেশ বড়ুয়া মৃদু হাসলেন। আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম। আধঘণ্টার জায়গায় প্রায় একঘণ্টা কাবার। তাছাড়া বলার মত কোন কথা নেই। গৃহকর্তাও যেন কথা বলার মুডে নেই। এবার বিদায় নিতে হয়। বললুম, 'চলি। আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হল।'

তিনি কোন কথা বললেন না। মুখে সেই বিষণ্ণ হাসি।

নমস্কার করতেই তিনিও কর যুক্ত করলেন। আমি কয়েক পা সরে সিঁড়ি ধরলুম। তিনি বইয়ের পাতায় ডুব দিলেন। আমি ততক্ষণে ফের সেই ফটকের দোরগোড়ায়।

পেছন ফিরে তাকালুম। মনে হ'ল, বাড়িটার সঙ্গে বাড়ির মালিকের কোথায় যেন মিল আছে। দুজনেই জীর্ণ, দুজনেই ক্লান্ত। অবসন্ন। শির এখনও সমুন্নত, কিন্তু সূর্য হেলেছে পশ্চিমে।

বাড়ির মালিকের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। তারপর ১৪ নম্বরের বাড়িতে গিয়েছি অনেকবার। পলেস্তারা আরও পড়েছে, আগাছা আরও বেড়েছে। বাড়ির মালিকও বিগত। বেঁচে আছেন শুধু নামে। বছরের পর বছর যায়, সেই অদ্বিতীয় নামেও পলেস্তারা পড়ছে।

শান্তিনিকেতনে অভিনয়

মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে এক ভদ্রলোক শান্তিনিকেতন বেড়াতে এসে সেখানকার বিরাট খেলার মাঠ ও খেলাধুলোর জনপ্রিয়তা দেখে চোখ দুটো কপালে তুলেছিলেন। বলেছিলেন, 'সে কি মশাই, এখানে খেলার পাটও আছে নাকি? আমি তো জানতুম—'

ভদ্রলোকের চোখ কপাল থেকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে আমি তৎক্ষণাৎ সাহায্য করি। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর বদ্ধমূল ধারণাকে চট করে লুফে মাঝপথেই সংযোজন করি—'আপনি জানতেন, এখানে কেবল চলে ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লেখা, নাকিসুরে গান আর অষ্টপ্রহর মণিপুরী কথাকলির ধেই ধেই, ফুটবল-ক্রিকেটের নামও শোনে নি এখানকার ছেলেমেয়েরা, এই তো! তা, আজ্ঞে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, কলকাতার অনেক বাঘা বাঘা ফুটবল টিম এখানে এসে ঘায়েল হয়ে গেছেন, ক্রিকেট-হকি-টেনিস-ভলিবল, কোন খেলাতেই এ জায়গা কম যায় না।'

এই ভদ্রলোকটি একক নন, এই রকম আরও অনেকের মনে এই ধরনের আজগুবি ধারণা রয়েছে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে। তাঁদের ভুল ভাঙে জায়গাটায় দু-চারদিন থাকলে।

বাইরের লোকের আর একটি ধারণা যে, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়া আর কিছুই অভিনয় হয় না।—এটিও মিথ্যে।

রবীন্দ্র-প্রভাবে পুষ্ট শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নাটক বেশী অভিনীত হবে—এ তো সোজা বাংলা কথা। রবীন্দ্রনাথকে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব তো শান্তিনিকেতনেরই

বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন পাকা অভিনেতা। তাঁর সংস্পর্শে এসে সেখানকার লোকেদের মধ্যে সহজেই গড়ে উঠেছে সহজাত অভিনয়-ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনও নানা রকম নাটক, খুশীমত যখন-তখন করা যায় এবং সেই কারণে হয়ও। তবে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেকের নাটকও সেখানে অভিনীত হয়।

দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়া আর যে-সব বাংলা নাটক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তার প্রায় সব ক'টাই হাস্যরসের। এর কারণ হয়তো শান্তিনিকেতনের লোকেদের প্রবণতা ওই কৌতুক-রসের দিকেই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও নৃত্যনাট্যের পর বেশী মঞ্চসফল হয় বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা, ইত্যাদি।

বাইরের নাট্যকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ-প্রসাদ বা শচীন সেনগুপ্তের নাটক শান্তিনিকেতনে কদাচিৎ হয়েছে। কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহ যে-সব নাট্যাভিনয়ে করতালি-উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সে-সবের অভিনয় সেখানে সম্ভবও নয়। কারণ, সেখানকার অভিনয়-রীতির জাত একেবারে আলাদা, —অতি-নাটকীয়তার স্থান আদৌ নেই।

গত কুড়ি বছরের হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখছি, রবীন্দ্র-নাট্য ছাড়া শান্তিনিকেতনে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে পরশুরাম-রচিত কয়েকটি গল্পের নাট্যরূপ। যেমন বিরিঞ্চিবাবা, লম্বকর্ণ, চিকিৎসা-সংকট, রাতারাতি, ভুশণ্ডীর মাঠে, ইত্যাদি। লম্বকর্ণের নাট্যরূপ দেন অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং। লম্বকর্ণ ও ভুশণ্ডীর মাঠে অভিনীত হয়েছে সর্বাধিক এবং দুটোই কলকাতা শহরেও করা হয়েছে কয়েকবার।

বছর ষোল আগে একবার হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একখানা নাটক হয় প্রমথনাথ বিশীর ঋণং কৃত্বা ও ঘৃতং পিবেৎ। বনফুলের

লেখা দু-একটি নাটকের, যেমন কবয়ঃ, অভিনয়ও দেখেছি। তাছাড়া প্রায়ই হয় সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরেজী নাটক এবং শেক্সপীয়ার বার্নার্ড শ-এর ইংরেজী নাটকও হয়েছে অনেকবার। তার মধ্যে জনপ্রিয় ওথেলো ও অ্যাণ্ড্রোক্লিস অ্যাণ্ড দি লায়ন। একটি হিন্দী নাটক হয় ১৯৪৫ সালে—প্রেমচাঁদের 'সতরঞ্চ কী খিলাড়ি'। সংস্কৃত নাটক হয়েছে অনেকবার। সর্বশেষ দেখেছি ১৯৫২ সালে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। তার আগে শুনেছি অষ্ট্রিয়ান মহাপণ্ডিত ভিণ্টারনিৎস্‌কে দেখানোর জন্যে অভিনীত হয় শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্।

১৯৫৭ সালে একবার অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় একটি গ্রীক নাটকের। নাটকটি শেষ-মেষ অভিনীত হয় না। একদিন রিহার্সেলেই হয়ে যায় ট্র্যাজেডি। সেই ট্র্যাজেডিতে প্রধান ভূমিকা নেন শিল্পী শ্রীরামকিংকর এবং তৎকালীন ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীসুধীন ঘোষ। ওই নাটক রিহার্সেলের সময় একটি ঘটনা এত তিক্তরূপ নেয় যে, সারা ভারত জুড়ে হয় দারুণ হৈ-চৈ এবং সুধীন ঘোষকে চিরকালের জন্যে ছাড়তে হয় শান্তিনিকেতন।

মোট কথা, নাটক-অভিনয়ের ব্যাপারে শান্তিনিকেতন দরাজ-দিল। রবীন্দ্রনাথের লেখা নয় বলে কোন আপত্তি ওঠে নি কখনও। শুধু যেখানে রুচির অভাব, সেইখানেই আপত্তি। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নাটকও অভিনয় করতে দেওয়া হয়। বহু বছর আগে তখনকার ছাত্রী এবং এখনকার নামকরা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের (ঘটক) একটি নাটক (সম্ভবত নাম 'সাতভাই চম্পা') অভিনয় হয়। বছর দশেক আগে এই অধমের লেখা একখানা নাটকও (তেপান্তরের মাঠে') কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করেছেন। আমার নাট্যরূপকৃত 'ভুশণ্ডীর মাঠে' সরকারীভাবেই হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের যে-সব নাটক অভিনীত হয়, বলা

বাহুল্য, বেশী সমাদৃত হয় চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা প্রভৃতি নৃত্য-নাট্য। তারপর কদর বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, তাসের দেশের। মায়ার খেলা এবং শাপমোচন বরং কম অভিনীত হচ্ছে।

অন্য নাটকের মধ্যে প্রায়ই হয় অরূপরতন, মুক্তধারা, ডাকঘর। রক্তকরবী হয়েছে বার দুই। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় রক্তকরবী হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। 'নন্দিনী' চরিত্রের জন্যে তাকে খোঁজাখুঁজি করতে হয় অনেক জায়গায়। রক্তকরবী আমি প্রথম দেখি ১৯৪৬ সালে। কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও নন্দলাল বসু দুজনে মিলে পরিচালনা করেন। বাঁশরী নাটকটিও সেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় হয় নি। প্রথম হয় ১৯৪৫ সালে। তারপর হয়েছে আর একবার। ১৯৫৫ সালে।

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-নাট্যের মধ্যে বৈকুণ্ঠের খাতা ও শেষরক্ষা নিয়ে টানাটানি পড়ে প্রায়ই। এবং এই সব নাটকের অভিনয়ই হয় অনবদ্য। গোরা হয়েছিল একবার শ্রীনিকেতনে। তাছাড়া লক্ষ্মীর পরীক্ষা স্কুলের মেয়েরা করে সুযোগ পেলেই। 'হাস্য-কৌতুক' ও 'ব্যঙ্গ-কৌতুকে'র ছোট নাটকগুলোও বাদ যায় না।

এই হচ্ছে মোটামুটি অভিনয়ের খতিয়ান। তার মধ্যে কিছু নাটক হয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায়। সেগুলো একেবারে সরকারী ছাপমারা এবং হয় বিভিন্ন উৎসবে, অনুষ্ঠানে। কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়, বিভিন্ন বিভাগ বা ব্যক্তির চেষ্টায়ও যখন-তখন নাটক নামানো হয়। এবং এই একটিমাত্র জায়গা, যেখানে স্বল্পমেয়াদী নোটিসে নাটক নামানো সম্ভব। ঝামেলা বিশেষ নেই, নাটক বাছাই করেই পাত্র-পাত্রী বাছাই। গান বা নাচের ভার দিতে হবে সংগীত-ভবনের উপর এবং মঞ্চ-সজ্জা ও চরিত্র-সজ্জার ভার কলাভবনের উপর। তারপর একদিন অভিনয়ের দিন ঘোষণা। অভিনয়ের জন্যে আছে তিন চারটে জায়গা সিংহ-সদন, লাইব্রেরী-বারন্দা, সংগীত-ভবন ভবন ইত্যাদি। ইদানীং বিচিত্রা ও আরও অনেক নতুন জায়গা

হয়েছে। বিকেল হলেই কলাভবনের ছেলেমেয়েরা লেগে গেল মঞ্চ সাজাতে। পড়ল নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা। ব্যস্, সবাই হাজির, দর্শকেরও কমতি নেই।

শান্তিনিকেতনের অভিনয় ও মঞ্চ-সজ্জার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পরই সবচেয়ে বেশী দান নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিনায়ক মাসোজি ও রামকিংকরের। তাঁদেরই অনলস পরিশ্রম ও চিন্তার ফসল আজকের এই প্রতীক মঞ্চরীতি। বিশেষ লক্ষণীয় যে চিত্রশিল্পে অ্যাবস্ট্র্যাক্‌ট আর্টকে শান্তিনিকেতন বিশেষ প্রাধান্য না দিলেও (ব্যতিক্রম রামকিংকর) মঞ্চ-সজ্জায় ওই আর্টেরই জয়-জয়কার।

এবং আজ গোটা বাংলাদেশ সেই শান্তিনিকেতনী মঞ্চ-সজ্জাকেই মোটামুটি বরণ করে নিয়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে শান্তিনিকেতন এবং শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা—বঙ্গদেশীয় আধুনিক মঞ্চ-রীতির এই বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ হয়নি। হওয়া উচিত।

তারার নাম অরুন্ধতী

শান্তিনিকেতনের খাতায় হাজিরা দেবার পয়লা দিনেই ধমক খেলুম এক সুন্দরী মহিলার, এবং কে জানত, ইনিই একদিন হবেন বাংলাদেশের নামজাদা অভিনেত্রী, ইদানীং যাঁর নাম চলচ্চিত্র বিলাসীদের ঠোঁটস্থ।

সুন্দরীর শাসনে আমার আদৌ আপত্তি নেই, কিন্তু 'প্রাতঃকাল দিনমানের দিগ্‌দর্শক' এই পাশ্চাত্য আপ্তবাক্য স্মরণ করে কদাচ ভাববেন না, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে, শান্তিনিকেতন জীবনের বাকি বার বছর মহিলা-মহলের ধমক খেয়েই আমাকে কাটাতে হয়েছে।

আজ থেকে বাইশ বছর আগেকার কথা। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাস। সিলেটের এক পাড়াগাঁ থেকে ছিটকে শান্তিনিকেতনের ফার্স্ট ইয়ার কলেজ-ক্লাশে ভর্তি হয়েছি। সেখানকার গাছের তলায় ক্লাশ, গাছের আগায় গান। ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে এবং মানুষ আর পাখির গলার মাখামাখি দেখে আমি স্রেফ কাঠ-বাঙাল বনে গেছি।

বিকেল বেলা গেছি খেলার মাঠে। মেয়েদের হোস্টেল শ্রীভবনের সামনে। সেদিন ছিল শিক্ষাভবন আর কলাভবন ও সংগীত ভবনের (আমরা বলতুম কলা-গলা) মধ্যে ভলিবল ম্যাচ। জোর খেলা চলছে, আমি একটেরে একঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখছি। একটু দূরে একপাল মেয়ের খিল খিল হাসি এবং নিজের দলের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে উৎক্ষিপ্ত উৎসাহবর্ধক চিৎকার।

হঠাৎ একটি মেয়ে দু' কদম এগিয়ে এসে কী যেন বললেন। না, নিশ্চয়ই আমাকে নয়। ও হরি, আমার ধারণা ধূলিসাৎ, উত্তর-দাতার ভূমিকা নিতে হবে আমাকেই।

উনি বললেন, 'স্কোর কী ?

আমি তাকাচ্ছি তাঁর মুখের দিকে। আমার চেয়ে বয়সে বড়, মুখখানা সুশ্রী। গলা মধুক্ষরা। নিশ্চয়ই রোজ মাখন খান।

'স্কোর কী ?' ফের প্রশ্ন।

আমি ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেলুম। সদ্য-বয়ঃসন্ধি উত্তীর্ণ হেঁড়ে গলায় জানতে চাইলুম, প্রশ্নকর্ত্রীর লক্ষ্য আমি কি না। বললুম, 'আমাকে বলছেন ?'

'হ্যাঁ তোমাকেই,' গ্রীবাখানা নব্বুই ডিগ্রী তেরচা করে সুন্দর মুখের মালিক সেই মাখন-ডোবানো গলাতেই বললেন, 'জিগগেস করছি, খেলার স্কোর এখন কী ?'

স্কোর ? সে আবার কী জিনিস ? আমি হাওড়ার পুল থেকে পড়ি। ভলি বল খেলার সঙ্গে এই শব্দটির কী সম্পর্ক ? নাকি কার কত পয়েণ্ট জানতে চাইছেন ? কিন্তু ইস্কুলে থাকতে তো আমরা বরাবরই পয়েণ্ট বলে এসেছি। না কি অন্য কিছু ?

আমি চুপ করে থাকি। ক্যাবলার মত ফ্যাল ফ্যাল তাকাই। না বাবা, যে জিনিস জানিনা, তার জবাব দিতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ব না।

ইতিমধ্যে সেই সুন্দর মুখ ভোল পালটেছে। ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি, চোখে তাচ্ছিল্য এবং তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলুম একটি দাঁত চাপা অর্ধস্ফুট বাক্য, 'ক্যাবলা কোথাকার।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে বারটি জলতরঙ্গের অর্কেস্ট্রা। দলের দ্বাদশ কন্যার কণ্ঠ থেকে পরিহাসের হাসি উপচে উপচে পড়ছে। এ দিকে হতবুদ্ধি আমি ঘেমে সারা, চটপট মাঠ ছেড়ে পালাই।

সেদিনের ঘটনার উপসংহার এইখানেই এবং খানিক পর 'স্কোর' আর 'পয়েণ্টের' সমান গোত্রত্ব আবিষ্কারের পর নির্বুদ্ধিতার লজ্জায় বেগনি।

পরদিন দুপুরে সেই মহিলার সঙ্গে শালবীথিতে দেখা। শান্তিনিকেতনের আকাশে বর্ষার ঘনঘটা, হাতির পায়ের মত শালগাছের মিছিল ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে, আমি উত্তরায়ণ থেকে হোস্টেলে ফিরছি। এমন সময় গানের কলি—'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো—।' খাসা গলা। চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি। সেই তিনি। আমি পাশ কাটিয়ে পালালুম।

ভদ্রমহিলা ততদিনে আমার কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এবং তাজ্জব কি বাত, যেখানেই যাই, প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। অথচ নাম জানি নে।

নাম জানা হল দিন চার পর। সেদিন ছিল আমাদের কলেজ ইউনিয়ন অর্থাৎ শিক্ষাভবন সম্মিলনীর সাধারণ সভা। গুটি গুটি সভায় বসতেই দেখি ভদ্রমহিলা ব্যস্ত সমস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দরজার কাছে মুখোমুখি পড়ে বেচারা আমি পালাবার পথ খুঁজে পাই না।

তিনি ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি। এবং সেই দিনই প্রথমে জানতে পারলুম তাঁর নাম অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা।

একদা আতঙ্কের কারণ এই অরুন্ধতী গুহঠাকুরতাই কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যান অরুন্ধতী দি। আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, একই কলেজে তিনি ফোর্থ ইয়ারের। ইকনমিক্সে অর্নাস।

শান্তিনিকেতন সিনেমা জগৎকে যে ক'টি রত্ন উপহার দিয়েছে তার মধ্যে অরুন্ধতীদি অন্যতম। পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, অরূপ গুহঠাকুরতা, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ওরফে ঢুলুদা, আলোকচিত্রীদের মধ্যে রামানন্দ সেনগুপ্ত, অভিনেতাদের মধ্যে বলরাজ সাহানী এবং অভিনেত্রীদের মধ্যে এই অরুন্ধতীদির নাম সবার আগে। তাছাড়া রয়েছে অম্বুভা ওরফে মৃদুলা গুপ্তা, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী। তাঁদের শান্তিনিকেতনের কুটুম বাড়িতে প্রায়ই যেতেন, হয়ত ছাত্রীও ছিলেন অল্প কিছুদিন।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র জ্যোতিপ্রকাশ এবং ছাত্রী মনিকা দেশাই যখন প্রথম সিনেমায় নামেন, তখন তাঁদের নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল বাংলাদেশে। শান্তিনিকেতনের ছাপ তাঁদের বাজার দর বাড়িয়ে ছিল। তারপর ধীরে ধীরে এ লাইনে শান্তিনিকেতন অনেক কুশলীকে দিচ্ছে।

আমাদের সময়কার তুজন শান্তিনিকেতনী এখন বাংলা সিনেমার আসর জমিয়ে রেখেছেন। অরুন্ধতীদি আর অনুভা। অনুভাকে মৃত্লা বলে জানতুম। সে ছিল আমার চেয়ে তু ক্লাস নীচুতে। অল্পদিন ছিল, কিন্তু সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। এবং স্বভাবে অরুন্ধতীদির উল্টো। রোজ বিকেলবেলা মাঠে লাফালাফি দাপাদাপি করত, ডন বৈঠক চালাত। সহপাঠী অনেক ছেলে মৃত্লার হাতের বিরাশী সিক্কা ঘুঁসি খেয়ে টের পেয়েছে তার চওড়া কব্জির জোর কত!

অরুন্ধতীদি অন্যরকম। নাচ গান হাসিতে সারাদিন বেহুঁশ। কলেজের পিকনিকে বলুন আর বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানে বলুন, তাঁর কদর সর্বত্র।

অরুন্ধতীদির ছোট ভাই প্রবীর গুহঠাকুরতা (বাদল) আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁর আর এক ভাই প্রণব গুহঠাকুরতা ও আমাদের আড্ডার দলের। তাই তাদের 'ছোড়দি'র সঙ্গে সহজেই ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলুম।

কস্মিনকালেও তাঁকে ভলিবল মাঠের সেই করুণ কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিই নি। অবশ্যি তাঁর কাছে ঘটনাটি তুচ্ছ। মনে থাকবার কথা নয়।

অরুন্ধতীদি বি. এ. পাশ করে শান্তিনিকেতন ছাড়েন। ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালের এম. এ. ক্লাসে। ইতিমধ্যে তাঁর গানের রেকর্ড বেরিয়েছে 'খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে।' তারপর দেখা হত কদাচিৎ। ১৯৫১ সালে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরল অন্যদিকে।

হঠাৎ তিনি স্থির করে বসলেন সিনেমায় নামবেন। ছবি নিউ থিয়েটার্সের 'মহাপ্রস্থানের পথে'। অরুন্ধতীদি ছদ্মনাম নিলেন। কাগজে বেরোল রাণীর ভূমিকায় নামছেন 'নবাগতা শিক্ষিতা অমুশ্রী দেবী।'

নামটা আমার পছন্দ হয় নি। বন্ধু বাদলও তাই বললে। কলকাতার রাস্তায় ওই নামে নাকি কাপড়ের দোকান আছে। দুজনে গেলুম অরুন্ধতীদির বাড়িতে। তিনি তখন থাকেন লেক টেম্পল রোডে তাঁর দাদা পতঞ্জলি গুহঠাকুতার বাড়িতে। গিয়েই বললুম, 'আপনাকে নাম পালটাতে হবে। কেন, নিজের নামটা কী দোষ করল।'

অরুন্ধতীদি রাজী হলেন। প্রচার-ঘোষণায় আসল নাম ফিরে এল।

'মহাপ্রস্থানের পথে' অরুন্ধতীদির গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেয়। তারপর থেকেই একের পর এক সাফল্যের সোপান বয়ে যায় তাঁর জয়যাত্রা।

১৯৫১ সালের আর একটি ঘটনা দিয়ে এ কাহিনী শেষ করি।

শিলচর থেকে এক পরিচিত লিখে পাঠালেন তাঁরা সেখানে গানের আসর বসাবেন, আমি যেন কিছু নামকরা শিল্পী নিয়ে আসি। শান্তিনিকেতনের দু'চার জন থাকলে ভাল হয়।'

আমি অনুরোধে সাড়া দিলুম। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীনদাস মতিলাল, বিশ্বজিৎ রায়, শুভময় ঘোষ, প্রবীর গুহঠাকুরতা (বাদল) ও অরবিন্দ বিশ্বাসকে প্লেনে শিলচর পাঠানোর ব্যবস্থা করলুম। হঠাৎ খেয়াল হল অরুন্ধতীদিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়। তাঁকে ধরতেই তিনি রাজী। শুধু বললেন, 'মহাপ্রস্থানের' শুটিং চলছে, দেখ, তার যেন অসুবিধা না হয়।'

আমি সব ব্যবস্থা করলুম এবং বলে এলুম, অমুক দিনে অমুক সময়ে এসে দমদম নিয়ে যাব। সেখান থেকে প্লেনে সোজা শিলচর।

কথাবার্তা সব পাকা। যেদিন রওনা হব তার আগের দিন রাত বারটায় এক জরুরী টেলিগ্রাম। শিলচরের সেই উদ্যোক্তা ভদ্রলোক লিখেছেন, 'জলসার তারিখ একহপ্তা পিছিয়ে গেছে, এখন রওনা হবেন না।'

আমার মাথায় বজ্রঘাত। সব ঠিকঠাক। টিকিটও কাটা। এখন কী করি! ট্যাক্সি হাঁকিয়ে ছুটে গেলুম এয়ারওয়েজ অফিসে। গুচ্ছের টাকা গচ্চা দিয়ে একগাদা টিকিট নাকচ করালুম এবং জনে জনে সবাইকে পরদিন সকালে তৈরী হতে মানা করে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন রাত কাবার। বাড়িতে ঢুকতেই মনে পড়ল অরুন্ধতীদিকে জানানো হয়নি, সর্বনাশ!

এ দিকে আর দেরি নেই। প্লেন ছাড়ার কথা ভোর সাতটায় এবং ঠিক আছে সাড়ে পাঁচটায় তাঁকে আমি তুলে নিয়ে আসব। আমার মাথা তাজঝিম, মাজঝিম শুরু করে দিল।

ফের চললুম ৩৫ নং লেক টেম্পল রোডে। অরুন্ধতীদির বাড়িতে। তিনবার ঢোঁক গিলে তাঁদের ড্রয়িং রুমে যখন ফাঁসির আসামী আসামী চেহারা করে ঢুকলুম, দেখি একটা বড় স্যুটকেশ আর একটা গাব্দা-গোব্দা হোল্ডঅল কার্পেটে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার মানে অরুন্ধতীদি যাবার জন্যে রেডি। আমি চোখে অন্ধকার দেখলুম। এখন কী কৈফিয়ৎ দি?

চোখ খুলতেই সামনে একগাল হাসি নিয়ে অরুন্ধতীদি। সেজে গুজে তৈরী। কাছে এসে বললেন, 'তাহলে রওনা হওয়া যাক।'

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। কথা বেরেতো পারছে না। কয়েক-বার আমতা আমতা করে এক গ্লাস জল চাইলুম। অরুন্ধতীদি আমার রকম সকম দেখে অবাক, অথচ কিছুতেই আসল কথাটা পাড়তে পারছি না।

জল খেয়ে উঠে দাঁড়ালুম। গড় গড় করে নামতা পড়ার মত

বুক ঠুকে বলে ফেললুম, 'অরুন্ধতীদি মাফ করবেন, আজ যাওয়া হবে না। ভীষণ অঘটন ঘটে গেছে।'

'কী কাণ্ড!' বলেই তিনি ঢাউস সোফাটায় বসে পড়লেন। আমি ফাঁক পেয়ে আবার বললুম 'উদ্যোক্তারা কাল রাত্রে টেলিগ্রাম করেছে। জলসার তারিখ পিছিয়ে গেছে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলুম। অরুন্ধতীদির বেকুব মুখের দিকে তাকাবার সাহস আমার নেই।

সাতদিন পর অন্য সবাই গান গাইতে শিলচর গিয়েছিল, অরুন্ধতীদি যান নি? কাজ পড়ে যায়। এবং তারপর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।

ভুল বললুম, দেখা হয়—সিনেমার পর্দায়।

সিনেমা-লাইন

সিনেমা-লাইনের একটা দিক আমি একবার চাক্ষুষ দেখে এসেছি। অনেকটা জেনেও এসেছি। ভয়ে আর ভিড়ি নি। তবে আগেই বলে রাখি, ভাল অন্যদিকও অবশ্য আছে।

সে আজ বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। ১৯৫০ সাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। একদিন বসে আছি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের অফিসে। হঠাৎ মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এসে হাজির। ইউনিয়নের সভাপতি, আমাদের বন্ধু মনোজ বড়ুয়াকে ভদ্রলোক বললেন,—আমি টালিগঞ্জ থেকে আসছি। সিনেমার সঙ্গে আছি। একটি গল্প তুলছি, তার নায়ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। নায়িকা শান্তিনিকেতন থেকে বি. এ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। এই গল্পের ব্যাপারে আপনাদের একটু সাহায্য চাই, হেঁ হেঁ।

সিনেমা পাড়ার লোক, তদুপরি সাহায্য প্রার্থনা, আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ আগ্রহী। মনোজ বললে,—ঠিক আছে, কিছু ভাববেন না, আমরা সাহায্য করব। তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে ফের বললে,—এঁকে নিয়ে যান। শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বিশ্বভারতী, কলকাতা, দুই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নাড়ি নক্ষত্র জানে।

ভদ্রলোক আমাকে বঁড়শিতে গেঁথে তুললেন। এবং খানিক বাদেই সিনেমা পাড়া টালিগঞ্জের ইন্দ্রলোক স্টুডিওতে আমি উৎক্ষিপ্ত।

ইন্দ্রলোক স্টুডিও টালিগঞ্জের প্রায় শেষ প্রান্তে। খবর রাখিনা, আজকাল বোধ হয় বন্ধ। এই স্টুডিওতেই আমার জীবনের কয়েকটি অদ্ভুত দিন কেটেছে। বলতে দ্বিধা নেই, আমি

হাতে আশমান পেয়েছিলুম সেদিন। রূপকথার জগৎ সিনেমার সঙ্গে এত অল্প বয়সে যোগাযোগ হওয়া যে বরাতের কথা।

যাই হোক, ভদ্রলোকটি আমাকে স্টুডিওতে অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।—ইনি পরিচালক, হেঁ-হেঁ ইনি ক্যামেরাম্যান, হেঁ-হেঁ ইনি এই যাকে বলে ফিনান্সিয়ার। আর হেঁ-হেঁ অমুক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধরে এনেছি, হেঁ-হেঁ একখানা 'জুয়েল', ইনিই আমাদের 'অধিনায়কের' গল্প লিখবেন।

ভদ্রলোক বলেন কী! আমি তো স্রেফ পরামর্শ দিতে এসেছি, গল্প লিখব কেন? সিনেমার গল্প লেখার কীই বা জানি আমি!

ভদ্রলোক বোধ হয় আমার মনের অবস্থা আন্দাজ করেছিলেন। কানে কানে ফিসফিস করে বললেন,—কিস্সু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব। কাল সকালে আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসব। ঠিকানাটা রেখে যাবেন।

পরদিন আমাকে সত্যি সত্যিই তুলে নিয়ে এলেন। পথে গল্পের কাঠামোটাও বলে দিলেন। নায়কের নাম প্রলয়—ছাত্র ও সমাজসেবী। নায়িকা শম্পা—ছাত্রী ও বড়লোকের অর্থাৎ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মেয়ে। শম্পা, পম্পা, চম্পা তিন বোন। গল্পে একটি ট্রেন দুর্ঘটনা থাকবে, বস্তি থাকবে, গ্রেট ইস্টার্ণে একটি পার্টি থাকবে, একজন চতুর মারোয়াড়ী থাকবে এবং বলা বাহুল্য নায়ক-নায়িকার প্রেম থাকবে। বাপ বিয়ে দিবে না, তবু মেয়ে গরিবের ছেলেকে বিয়ে করবেই ইত্যাদি। ব্যস, আর দরকার নেই, ও-ই নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলুন। আপনার চেহারা দেখেই চিনেছি আপনি পারবেন। আর হ্যাঁ, চিত্রনাট্যও আপনাকে তৈরি করতে হবে। না না, কিস্সু ভাববেন না, ডিরেক্টর আপনাকে হেলফ্ করবে।

আমি ততক্ষণে শেয়ানা হয়ে গেছি। বললুম,—ঠিক আছে, আমি পারব।

স্টুডিওতে আমার জন্যে আলাদা একটি ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি সেখানেই গিয়ে বসলুম। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, কাগজের দিস্তে, কালি কলম, বেয়ারা। পাকা বন্দোবস্ত।

খানিক বাদেই ডিরেক্টার হাজির। স্টুডিওতে তখন আর একটি বইয়ের সুটিং চলছে। নাম 'মুখোশ'। 'অধিনায়ক'—এবং 'মুখোস' দু' বইয়ের একই ডিরেক্টার। ডিরেক্টার আমাকে ওয়াইপ, মিক্স, মন্তাজ, ফেড ইন, ফেড আউট ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য ভাল করে বুঝিয়ে তাঁর নানা রকম আইডিয়া আমাকে গলাধঃকরণ করালেন এবং তারপর মাথায় দিলেন হাতুড়ির ঘা। তিনি বললেন,—শুটিং শুরু হবে ৮ই, আজ ২রা, এই কদিনে আপনি লাস্ট সিনের ডায়লগগুলো তৈরি করে ফেলুন।

সর্বনাশ, এখন উপায়? ডিরেক্টর অভয় দিলেন,—আমি বলে বলে যাব, আপনি শুধু গুছিয়ে লিখে ফেলবেন।

—কিন্তু স্টোরিই যে লেখা হয়নি!

—তার দরকার নেই, শুটিং আর গল্প এক সঙ্গেই চলবে। যা বলছি শুনুন, লাস্ট সীনের সেট তৈরির হুকুম হয়ে গেছে। একটি জঙ্গলের মধ্যে ভাঙ্গা বাড়ি। নায়ক প্রলয় শেষ বক্তৃতা দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর ফিরে আসবে না।

—কোথায় চলে যাচ্ছে?

—তার ঠিক নেই। দরকারও নেই। একটু স্থির হয়ে বসুন, আপনাকে পুরো গল্প বুঝিয়ে দিচ্ছি।

পুরো তিন ঘণ্টার ধস্তাধস্তিতে আমি সব কায়দা কানুন জেনে নিলুম। ডিরেক্টার ভদ্রলোকটি সদাশয় এবং আময়িক। বললেন, — দুশ্চিন্তার কারণ নেই, আমাদের এমনিই হয়ে থাকে।

এদিকে আমি ইউনিভার্সিটির ক্লাশ কামাই করতে সুরু করে দিলুম। রোজ সকালে স্টুডিওর গাড়ি বাড়ি আসে, গটগট করে চলে যাই। স্টুডিওতেই ফ্রি খাওয়া-দাওয়া, ফিরি রাত

ন'টায়। প্রথম দিনের সেই ভদ্রলোক—পরে জেনেছি তিনি প্রডিউসার—ঘন ঘন আমার ঘরে আসেন, নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন এবং নিজের থেকেই একদিন বললেন—দু হাজার টাকা আপনি পাবেন, চুক্তিটা সই হলেই অর্ধেক পেয়ে যাবেন। বাকি আদ্ধেক পাবেন মাস দুই পরে।

দু'হাজার টাকা! আমি মনে মনে চঞ্চল হয়ে পড়ি। মুখে বলি,—ঠিক আছে, টাকার জন্য ভাববেন না।

—সে আমি জানি, ভদ্রলোক মুখ টিপে হেসে বললেন,—এবং জানি বলেই তো আপনাকে নিয়ে এসেছি।

একদিন শুভ মহরৎ হয়ে গেল। আমি ঝেঁটিয়ে সব বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গেলুম। মহরতের ছবি তোলা হ'ল। শুনলুম গুরুদাস ব্যানার্জী নায়কের পার্ট করবেন। তিনি এসেছেন, আর এসেছেন মেয়ে কয়েকজন। পদ্মা দেবী, প্রণতি ঘোষ, কবিতা সরকার (তখনও 'রায়' পদবী পান নি), স্বাগতা চক্রবর্তী ইত্যাদি। 'ছিন্নমূলের নায়ক প্রেমতোষ রায়ও হাজির, এইসব তারকাদের মধ্যে ঘোরাফেরা ক'রে সবার সঙ্গে কথা বলে আমার তো একেবারে 'পুচ্ছটি-তোর উচ্চে-তুলে-নাচা' ভাব।

এদিকে আনন্দ বাজার, বসুমতী, অমৃত বাজার, সব কাগজে 'প্রস্তুতির পথে অধিনায়ক' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তি ঘটা করে প্রচারিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে কাহিনীকার হিসাবে নিজের নাম দেখে আনন্দে মূর্চ্ছা যাই আর কি।

বন্ধুবান্ধবদের ভেতরও খাতির বেড়ে গেছে রাতারাতি। হিংসেও করছে দু'চার জন। কেউ বলে 'লাকি চ্যাপ', কেউ বলে, 'শাবাস'। ক্লাশে বা কফিহাউসে গেলে সবাই ছেঁকে ধরে। দু'একজন আবার বাড়ি এসে চড়াও হয়।—'দে না ভাই একট চান্স। দেখিস, অভিনয়ে ফাটিয়ে দেব।' কাউকে নিরাশ করি না, বলি,—অমুক সময়ে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে দেখা করিস।

শান্তিনিকেতন চলে গেলুম একদিন ছুটি নিয়ে। আমার পুরানো জায়গার প্রতিক্রিয়াটিও তো দেখা চাই। সেখানে পেলুম জোর খাতির।

—'কী রে অমিত, সিনেমাটা দারুণ বাগিয়েছিস তো ?'—'অমিতদা আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিন না!' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সবাইকে অভয় বাণী দিয়ে বুক চিতিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। শুধু আমার মাস্টারমশাই অনিলকুমার চন্দ বললেন—'সিনেমায় গল্প লিখছ, ভাল, কিন্তু একটু সাবধানে থেক।

প্রথম স্যুটিংয়ের দিন ঘনিয়ে এল। আমার লাস্ট সীনের ডায়লগ লেখাও শেষ। ডায়লগ লেখায় সাহায্য করতে নিয়ে এসেছি আমার সহপাঠী বন্ধু আশিস দত্ত, সুধাংশু গুপ্ত এবং নির্মল চক্রবর্তীকে।

স্যুটিংয়ের দিন চেনাশোনা ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে এলুম স্টুডিওতে। এতবড় একটা ঘটনা হয়ে যাচ্ছে আর ওরা দেখবে না, সে কি হয়। আমার দাপটটাও তো দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

স্যুটিংয়ে এসে দেখি চমৎকার সেট। এন-জি, মনিটর ইত্যাদি শব্দও ততদিনে জেনে গেছি, রঙীন ধুতি পাঞ্জাবী পরে পুরুষ চরিত্র আর রঙটঙ মেখে নারী চরিত্রের দল সেটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মহরতে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেখলুম গরহাজির। কী ব্যাপার ? শুনলুম শেষ মুহূর্তে প্রণতি ঘোষ (এখন ভট্টাচার্য) বাদ পড়েছেন এবং নায়ক প্রলয়ের পার্ট করবেন গুরুদাসের বদলে বিমান ব্যানার্জী। প্রণতি আমার পরিচিত, তার সঙ্গে প্রডিউসারের যোগাযোগ আমিই করিয়ে দিয়েছিলুম। তাকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকল।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে প্রথম দিনের স্যুটিং কোন ক্রমে কেটে গেল। তারপর হ'ল এক নাগাড়ে আরও তিন দিন। ব্যাস,

চতুর্থ দিনেই 'প্যাক আপ।' সেট ভাঙো, তারিখ নাও পরের স্যুটিংয়ের।

এদিকে আমার গল্প ও সংলাপ লেখার কাজ পুরো দমে চলেছে 'আমার গল্প' বলা ভুল, সব ঘটনা, সব আইডিয়া প্রযোজকের। আমি শুধু জোড়াতালি দিয়ে কাঠামোটা খাড়া রাখছি।

একদিন প্রযোজক এক ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন,—ইনি অমুক—নিউ ফাইণ্ড। এঁর উপযোগী একটা চরিত্র তৈরী করে ফেলুন—সাইড রোল।

আমি বললাম—তথাস্তু।

আর একদিন প্রযোজক ডিরেক্টারকে সংঙ্গে নিয়ে এসে নতুন আর্জি পেশ করলেন—একটা হাসপাতালের সীন জুড়ে দেবেন, বুঝলেন। নায়ক বাস-দুর্ঘটনায় পড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে।

আমি বললুম—তথাস্তু।

আর একদিনের কথা। আবার সেই প্রযোজক। বললেন,—বস্তিতে কলেরা লেগেছে। নায়ক প্রলয় কলেরা রোগীর সেবা করছে এই রকম একটা সীন দরকার।

আমার মুখে সেই একই উত্তর; তথাস্তু।

নানাপ্রকার খোঁচাখুঁচি আর সংযোজনে গল্পটা দাঁড়ালো কিম্ভূত কিমাকার। আমি আপত্তি করি না, যদি হাতছাড়া হয়ে যায়। কনট্রাক্টে সইও হয় নি।

কনট্রাক্টের কথা একদিন তুললুম। প্রযোজক হাতে একশ' টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন,—তার জন্যে ভাববেন না, দু'একদিনের মধ্যেই করে দিচ্ছি। আচ্ছা, টাকাটা নগদ না চেকে নেবেন?

আমি একশ টাকাতেই খুশি। বললুম,—নগদ বা চেক, যা দেবেন, তাতেই আমি রাজী।

যাচ্ছেতাই সেই গল্পের সুটিং ততদিনে আদ্ধেক প্রায় শেষ। কাগজে কাগজে প্রচারের কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। আমিও ততদিনে মোটামুটি সিনেমা পাড়ার লোক। এম-এ পাশ করে এই লাইনে যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করব, সে বিষয়ে মনঃস্থিরও করে ফেলেছি।

হঠাৎ একদিন মাথায় বজ্রাঘাত। ডিরেক্টার আমার বাড়িতে এসে বললেন,—মশায় কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। প্রডিউসার পালিয়েছে। কেউ টাকা পায় নি। আমি না, ক্যামেরাম্যান না, আর্টিস্টরা না, স্টুডিও ফ্লোরের ভাড়াও অনেক টাকা বাকী।

—তার মানে?—আমার সবিস্ময় জিজ্ঞাসা।

—মানে খুব সোজা। ডিরেক্টার জবাব দিলেন,—কোন এক জমিদারের চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে প্রযোজক সিনেমায় হাত দিয়েছিল। হাজার কুড়ি খরচ করে বাকী টাকা এদিক সেদিক করেছে। এখন ভোঁ-ভাঁ। প্রযোজকের পাত্তা নেই, জমিদারটি মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। সিনেমা আর হবে না। এখন কী করা যায় বলুন তো!

কী আর করা যাবে, এক নিমিষে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। আমি দুকান মলে ঠিক করলুম, আর ও দিকে না, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন এম-এ পরীক্ষাটা ভালয় ভালয় দিতে পারলে হয়। গত ছ'মাস তো ক্লাশের সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক পাতিয়েছিলুম।

কিন্তু প্রশ্ন, বন্ধুবান্ধবরা কী ভাববে? খুব তো ফলাও করে নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়েছিলুম, হেন করছি তেন করছি বলে বাহবা নিচ্ছিলুম,—এখন?

এখন সিনেমা লাইনের খুরে দণ্ডবৎ। ছ'মাসের পরিশ্রমে হাতে এসেছে কুললে একশ টাকা, সিনেমাও উঠলো না। এমন হবে জানলে আগেই না হয় বেশি কিছু টাকা নিয়ে নিতুম।

কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা তো পাওয়া যেত। তবে দিত কিনা কে জানে। নিশ্চয়ই গোড়া থেকে না দেবার মতলব ছিল। এবং গোড়া থেকেই বোধহয় ঠিক করে নিয়েছিল সিনেমা মাঝ পথে থামিয়ে দেবে। নইলে আমার মত অনভিজ্ঞকে না চাইতেই গল্প লিখতে ডেকে নিয়ে যাবে কেন?

মুখ গোমড়া করে আবার ক্লাশে মন দিলুম। সিনেমার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলেই বলি,—হচ্ছে, তবে জানই তো ভাই—এ লাইনে কত ঝামেলা। টাকার জন্যে আপাতত আটকে আছে।

দিন যায়। সিনেমা লাইনের কথা আমিও প্রায় ভুলেছি। এম-এ পাশ করে আবার শান্তিনিকেতনে চলে গেলুম। এবং শেষ পর্যন্ত 'অধিনায়ক' প্রসঙ্গ একটা হাসির গল্পের খোরাক হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু নিজে ছাড়লেও 'কমলি' ছাড়বে কেন? সিনেমা-লাইন শান্তিনিকেতনে এসে একদিন ধাওয়া করল। এবং সেই কাহিনীই সবচেয়ে মজার।

বোধহয় ১৯৫৪ সাল। দুপুর বেলা ঘরে শুয়ে আছি। হঠাৎ দরজায় টোকা। দরজা খুলতেই 'অধিনায়ক' যুগের একজন এসিঃ ডিরেক্টার। সে সময় ওঁর সঙ্গে বেশ খাতির হয়েছিল।

সঙ্গে আর একজন গোবেচারী ভদ্রলোক। দুজনকে সাদরে ঘরে নিয়ে এলুম। পরিচয় বিনিময়ও হলো। এসিঃ ডিরেক্টার বললেন সিনেমার জন্যে আপনার একটি গল্প চাই, কোন আপত্তি শুনব না। আপনাকে রাজী হতেই হবে। কোন তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে দেবেন।

নেড়া বেলতলায় একবারের বেশি যায় না। আমিও যেতে চাইলুম না। কিন্তু অনুরোধের চাপে 'না' করার উপায় নেই। সঙ্গের সেই ভদ্রলোক এতক্ষণে মুখ খুললেন,—আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমরা পরের ট্রেনেই চলে যাচ্ছি। এই নিন

একশ টাকা—আপনার কাগজ কালি ইত্যাদি কেনার জন্যে অল্প কিছু। না-না, আপত্তি করতে পারবেন না, আপনাকে নিতেই হবে।

ভদ্রলোক জোর করে আমার হাতে দশ টাকার দশ খানা নোট গুঁজে দিলেন। কী বিপদেই পড়েছিরে বাবা!

তারপর নানা গল্প। হঠাৎ এসিঃ ডিরেক্টার আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেলেন। ফিস ফিস করে বললেন—আপনাকে কস্মিন কালেও গল্প লিখতে হবে না। আমি চাল মেরে ওই বোকা লোকটাকে নিয়ে এসেছি। পঞ্চাশ টাকা আমাকে দিয়ে দিন, বাকি টাকা আপনার।

পরের ট্রেনে দুজনে ফের কলকাতা। আমি ওই টাকায় 'কালোর দোকানে' সবান্ধব চপ কাটলেট ধ্বংস করলুম। এবং বলা বাহুল্য, অগ্রিম দাদন দেওয়া সেই গল্প কস্মিনকালেও লেখা হয় নি।

পঁচিশে বৈশাখের ডাক

কোন বঙ্গসন্তানকে তুষ্ট করতে হলে দুটি মন্ত্র জানা চাই। বলতে হবে কলকাতার মত দোসরা শহর আর নেই। তার পরেই গাইতে হবে গুন গুন রবীন্দ্রসংগীতের একটি কলি। ওতেই আমরা কাৎ। তদুপরি যদি কোন অবাঙালী গড়গড় বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তাহলে তো সোনায় সোহাগা, মিস্টার ক্যাল-কেশিয়ান তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন, বলবেন, আমার বাড়িতে মহাশয়ের পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হয়।

এই মন্ত্র যাঁদের যাঁদের জানা, তাঁদের অন্যতম শ্রীগোপাল রেড্ডি—একদা কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী। নিবাস অন্ধ্রপ্রদেশ, ভাষা তেলেগু; কিন্তু যখন বাংলা বলেন, মনে হবে বীরভূম বর্ধমানের লোক। তা খানিকটা সত্যিও বটে। গোপাল রেড্ডি—বীরভূমের একটি জায়গা তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলেই মনে করেন এবং সেই কারণেই বাংলা সিনেমা, বাংলা ভাষা, বাংলা দেশ সম্পর্কে তাঁর এত টান।

গোপাল রেড্ডি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। এসেছিলেন রবীন্দ্র-নাথ পড়ার তাগিদে, এসে হয়ে যান খাঁটি বাঙালী। শান্তি-নিকেতনের মাটির এমনই গুণ, দুদিন যেতে না যেতেই সব আগন্তুকের মনে গেরুয়া-রঙে ধরিয়ে দেয়। গুজরাতী, কেরলী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয়া সবারই মুখে শোনা যায় বাংলা গান, বাংলা ভাষা। এই দলে এসে যোগ দেন একেবারে ভিন্ন-ভাষী বিদেশীও।

গোপাল রেড্ডি অল্প কয়েক বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেখানেই তাঁর দীক্ষা রবীন্দ্রসঙ্গীতে। শুনেছি, অন্ধ্রপ্রদেশের

এক রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন শুধু একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে।

গোপাল রেড্ডি কবে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছেন কিনা, ইত্যাদি জানার কৌতূহল ছিল। নানা আসরে, অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু মন খুলে আলাপ করার সুযোগ পাই নি।

বছর কয়েক আগের কথা, সুযোগ এল হঠাৎ। দেখা করলুম গিয়ে আলিপুর রোডের এক বাড়িতে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার পর ঘন ঘন তিনি কলকাতায় আসেন এবং এলে সাধারণত ওই বাড়িতে ওঠেন।

প্রথমে দু-চারটে খুচরো আলাপ। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শান্তিনিকেতনের কয়েকজনের কথা, অমুক কেমন আছেন, অমুক এখন কোথায়, ইত্যাদি। তারপরেই তুললেন আজকালকার গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা। বিশেষ একজন আধুনিক-কাম-রবীন্দ্রসংগীত-গাইয়ের কথা উল্লেখ করে বললেন—"গলা ভাল, কিন্তু বড় চাল মারে।"

রবীন্দ্রসংগীতের ভাষান্তর নিয়ে যে পরীক্ষা চলছে, তা অন্য প্রদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে বলে তিনি জানালেন। বললেন —'এত ভাল জিনিস শুধু বাঙালীদের এবং আমরা যারা বাংলা জানি, তাঁদের এক চেটিয়া হয়ে থাকবে কেন? অন্য সবাইকেও ভাগ দিতে হবে। তার জন্যেই আমরা রেডিও থেকে সব ভাষায় মূল-সুর বজায় রেখে রবীন্দ্রসংগীত রূপান্তরে হাত দিয়েছি। দেখবেন, অন্য প্রদেশের গান এই ভাষান্তরে যুগান্তর আনবে।'

নানারকম কথাবার্তার পর তাঁকে বললুম, 'আপনার শান্তি-নিকেতন জীবনের কথা বলুন, শুনতে চাই।'

গোপাল রেড্ডি সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। ধরালেন আর একটা সিগারেট। লুটিয়ে পড়া লম্বা ধুতির কোঁচা কার্পেট থেকে

গুটিয়ে কোলে রাখলেন এবং বার তিনেক সিগারেটে সুখটান দিয়ে শুরু করলেন স্মৃতিমন্থন।

'সে অনেকদিন আগেকার কথা'—গোপাল রেড্ডি শুরু করলেন —'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমার বড় দাদার মারফৎ। তিনিই আমাকে সেখানে নিয়ে যান।

'সেই জন্যে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। কেননা, গুরুদেব বেঁচে থাকতে আমি শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলাম।

'সেবার সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় হয়েছিল কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন। আমার দাদা সেই কংগ্রেসে যোগ দিয়ে যখন বাড়িতে ফিরলেন, তাঁর মুখে শুনলাম, শান্তিনিকেতন নামে একটি জায়গার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন গুরুদেবের বইয়ের কয়েকটি ইংরেজী অনুবাদ এবং উইলি পিয়ার্সনের লেখা শান্তিনিকেতনের উপর একখানি সচিত্র বই। আমার বয়স তখন তেরো। কিন্তু সেই বই আর ছবি দেখে দূর নেলোর জেলার একটি কিশোর মুগ্ধ, বিস্মিত। সে মনে মনে ঠিক করে নিল, তাকে রূপকথার জগৎ সেই শান্তিনিকেতনের ছাত্র হতে হবে।

'আমি তখন সরকারী ইস্কুল ছেড়ে মছলিপট্টমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার ছাত্র। দিনরাত গুরুদেবের লেখা পড়ি বিশেষ করে তাঁর ছোট গল্প আমায় পাগল করে দিয়েছে। 'ছুটি' 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', পড়ে আমার দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা বয় অঝোরে। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতাও ততদিনে আমার ঠোঁটস্থ। কিন্তু আপশোস, মূল বাংলায় কিছু পড়তে পারছি না। রস না জানি মূলে আরও কত।

'ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু শান্তিনিকেতনে পড়তে চলে গিয়েছে। সে প্রায়ই চিঠি লেখে। সেই চিঠিতে শান্তিনিকেতনের নানা রঙের দিনের কথা থাকে। আমি ছটফট করি, যে করেই হোক, যে-ভাবেই হোক, আমাকে সেখানে যেতেই হবে।

'দাদাকে ধরলুম। দাদা রাজী হলেন। মনে আছে ১৯২৪ সালের জুলাই মাস। তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেলেন। ভর্তি করিয়ে দিলেন শিক্ষাভবনে (কলেজে)।

'না, ইয়ারো ভিজিটেড' এর কবির মত আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নি। সেখানকার শালবীথি, আম্রকুঞ্জ, সেখানকার খোলা মাঠের মেলা, সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন এবং সর্বোপরি আশ্রমগুরুর উপস্থিতি এক নতুন আস্বাদ জীবনে এনে দিল, পদার্পণের প্রথম দিনেই শান্তিনিকেতন আমায় বুকে টেনে নিল। আমি তখন থেকেই 'শান্তিনিকেতনী' হয়ে গেলুম। মনে মনে ভাবলুম, আমার জীবন সার্থক।

'দিন কয়েকের মধ্যেই শুরু করলুম বাংলা ভাষা চর্চা। আমার গুরু হলেন, চলমায়—আমার স্বভাষী, এবং দীর্ঘকাল থেকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তাছাড়া অন্যসব বাঙ্গালী বন্ধু ও সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে বলেও কিছুদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা আমার রপ্ত হয়ে গেল। আমি 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ মূল বাংলাতেই পড়তে লেগে গেলুম। যেদিন প্রথম অক্ষর চিনে বাংলাতে এক একটি কবিতার পাঠোদ্ধার করি, আমার আনন্দ দেখে কে। মনে হচ্ছিল জোরে চিৎকার করি, বলি, 'আমি বাংলা পড়তে পারি।'

আমি শান্তিনিকেতনে বছর তিন ছিলুম। ১৯২৭ সালের এপ্রিল কোর্স শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসি। কিন্তু সেই তিন বছরের স্মৃতি আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয়, সবচেয়ে মধুর। আজ যখন সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরে তাকাই, আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, খোলা আকাশের তলায় গাছের নীচের ক্লাস, অধ্যাপকদের সরল ব্যবহার, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য, এবং গানে-কবিতায় নাচে ছন্দোময় জীবন। মন্দিরে সকাল বেলার উপাসনা, বিকেলে খোয়াইয়ের গেরুয়া আহ্বান, ছাতিমতলার ধ্যান গম্ভীর পরিবেশ সব একে একে ভিড় করে

আসে মনে। ভাবি, হায়, আর কোনদিন সে জীবন ফিরে পাব না।

'গুরুদেবের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভর্তির পরই দাদার সঙ্গে আমরা দুজনে দর্শন নিতে যাই। দাদাই বেশি কথা বললেন, আমি চুপ করে পায়ের কাছে বসে শুনছিলুম। তারপর ছাত্র অবস্থায় তিন চারবার টুকিটাকি কথা ছাড়া গুরুদেবের সঙ্গে বিশেষ কোন আলাপ আমার হয় নি। তবে প্রতি বুধবারে মন্দিরে যেতুম তাঁর উপাসনা ভাষণ শুনতে। প্রথম প্রথম বুঝতে কষ্ট হত, কিন্তু পরে তাঁর মুখে উপনিষদের ব্যাখ্যা ও মন্ত্রপাঠ আমার শান্তিনিকেতনে জীবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠল। আমি কোনদিনই 'মন্দির' বাদ দিতাম না।

'গুরুদেবের প্রায় সব বাংলা বই আমি পড়লুম। রবীন্দ্রসংগীত অনেকগুলো শিখে ফেললুম। অবশ্যি সেখানে, আপনি তো জানেনই, গান শেখার দরকার হয় না। যে জায়গার আকাশে-বাতাসে গান, সেখানে পৃথক সংগীত শিক্ষার কী প্রয়োজন। অনেক সময় উৎসব অনুষ্ঠানের গানের দলেও যোগ দিতুম। প্রকৃতি আর পূজার গানই আমার বেশী ভাল লাগত। বর্ষার সময় 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর' কিংবা ফাল্গুন পূর্ণিমার রাত্রে বৈতালিকের গান 'ও আমার চাঁদের আলো' এখনও আমার কানে বাজে। সরকারী ফাইলে কলম চালানোর ফাঁকে মনে মনে এখনও ওই সব গান গুণ গুণ করে গাই।

'১৯২৭ সালে যেদিন স্বর্গ থেকে বিদায়ের দিন এল, আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ি। শান্তিনিকেতন ছেড়ে কোনদিন চলে যেতে হবে, আমি ভাবতেই পারি নি।

'বৈশাখের এক দুপুরে উত্তরায়ণে গেলুম। বিদায়ের আগে গুরুদেবকে প্রণাম জানাতে। গুরুদেব আমায় আশীর্বাদ করলেন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বোলপুর ট্রেন ধরলুম। আমার দু-চোখ তখন ঝাপসা। ●

'শান্তিনিকেতন আমি ছেড়েছি ; কিন্তু শান্তিনিকেতন আমায় ছাড়ে নি। 'আমরা সেথায় মরি ঘুরে, সে-যে যায় না কভু দূরে।' —সব মিলিয়ে গোটা জায়গাটাকে কখনও আমার মনে হয় এক গীতিকবিতার মত। কখনও মনে হয় এক মোহিনী চুম্বকের মত। টানে, বার বার টানে। সেই টানেই আমি প্রাক্তন ছাত্র হয়েও অনেকবার গিয়েছি সেখানে, এবং এখনও সুযোগ পেলেই যাই। শান্তিনিকেতন আমার কাছে তীর্থস্থান, শান্তিনিকেতন আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি।

'১৯৩৫ সালে আমি আমার এক ভাইপোকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করিয়ে দিই। তখন আবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করি। ১৯৩৭ সালে যখন রাজাজীর মন্ত্রিসভায় মাদ্রাজের মন্ত্রী নিযুক্ত হই, গুরুদেব আমাকে চিঠি দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। গুরুদেবের যখন মৃত্যু হল, আমি তখন তিরুচিরপল্লী জেলের ভিতরে।

আর কী বলব! এক কথায় শুধু বলতে পারি আমার জীবনের দিগ্‌দর্শক শান্তিনিকেতন, প্রকৃত অর্থেই রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুদেব। এখনও তিনি আমাকে প্রেরণা দেন, এখনও আমায় শান্তিনিকেতন ডাকে। ভাবি, আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান ক'জন আছে।'

গোপাল রেড্ডি থামলেন। ততক্ষণে প্রায় এক প্যাকেট সিগারেট শেষ। অষ্টম সিগারেটে আগুন ধরিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন —'ভাল কথা, আর একটি ঘটনার কথা ভুলে গেছি। ১৯৩৮ সালে আমার বিয়ের ঠিক। বাড়ির সবাই শুভদিন ধার্য করার জন্যে বিস্তর গবেষণা চালাচ্ছেন। আমি তখন বললুম কাউকে কিছু ভাবতে হবে না, আমার বিয়ের তারিখ হবে ৮ই মে, অর্থাৎ পঁচিশে বৈশাখ। গুরুদেবের এই জন্মদিনের চেয়ে শুভদিন আর কী হতে পারে?

'আমার কথাই মেনে নেওয়া হল। পঁচিশে বৈশাখ আমার জীবনে ও আমার চিন্তায় একটি বিশেষ অর্থবোধক দিন। এই দিনটির পায়ে রোজ জানাই আমার প্রণাম।'

শ্রীরেড্ডি চুপ করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আমিও নির্বাক।

মিলি মাসী

ছিলেন মিলিদি, তুদিনের আলাপে হয়ে গেলেন মিলি মাসী। গোড়ায় অবশ্যি ছিলেন দূরের মানুষ সুপ্রভা মুখার্জি—বঙ্গ চলচ্চিত্রের সেই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী।

শান্তিনিকেতনে 'কোনার্ক' বাড়িতে শ্রীঅনিলকুমার চন্দের বাড়িতে এসেছিলেন অতিথি হয়ে। সেখানেই আলাপ। ভুল হল, আসলে আলাপের সূত্রপাত অন্য জায়গায়।

১৯৫২ সালের কথা বলছি। বোধহয় সেপ্টেম্বরের শেষ দিক। শান্তিনিকেতনে 'আনন্দ বাজার' বসেছে। গৌর প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীর শৌখীন দোকানের মেলা, ছেলে-বুড়োর আনাগোনা, কেনা-কাটা, হাসি হুল্লোড়, ভিড়। প্রতি বছরই বসে একদিনের 'আনন্দ বাজার'। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে দেয় খাবার দোকান, খেলনা দোকান, বসে ম্যাজিশিয়ান গণৎকারের আসর। লাভের টাকা জমা হয় 'দরিদ্র ভাণ্ডারে'। শান্তিনিকেতনের জীবনে বড় আকর্ষণ এই 'আনন্দ বাজার।'

সেবার আমি দিয়েছি এক নতুন ধরনের দোকান—"আনন্দময়ী কবিতা ভাণ্ডার। পাঁচ মিনিটে যে-কোন বিষয়ে যে-কোন কবিতা লিখিয়া দেওয়া হয়। সাধারণ প্রতি কবিতা চারি আনা। বিশেষ অর্ডারও লওয়া হইয়া থাকে। উহার প্রতি কবিতা আট আনা। অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ। উপজাতি, তপশীলী, শিশু ও নারীদের কনসেশন দেওয়া হয় না।—"

সাইন বোর্ড এঁকে ছিলেন রাণী চন্দ। উপরে আঁকা রইল সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরের উলটো ছবি। নীচে লেখা "উল্টা গণেশায় নমঃ।"

রঙীন কাপড় ঘেরা এক খুপরীর ভিতরে বসলুম আমি। চেয়ার টেবিল কলম কাগজ বাগিয়ে। এটাই কবিতা তৈরীর কারখানা। সামনের খোলা কাউণ্টারে বিজনেস ম্যানেজার হয়ে পাল্লা করে খদ্দের ডাকতে লাগল আমার প্রীতিভাজন শ্রীমান অমর্ত্যকুমার সেন এবং শ্রীমান মৃণাল দত্ত। দুজনেই দেদীপ্যমান ছাত্র, দুইজনেই বর্তমানে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ।

দারুন চাহিদা কবিতার। এক হাতে আর কুলোয় না। আমার খদ্দেরদের মধ্যে হোমরা-চোমরা এসেছেন অনেক। ডঃ প্রবোধ বাগচি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনিলকুমার চন্দ, শান্তিদেব ঘোষ অনেকে। হঠাৎ এক নতুন নামের চিরকুট এল কারখানার ভিতরে—'সুপ্রভা মুখার্জি।'

গলা বাড়িয়ে অমর্ত্যকে জিজ্ঞাসা করলুম "ইনি কে?"

অমর্ত্য চুপি চুপি বলল—"চিনলেন না অমিতদা, ফিল্মস্টার সুপ্রভা মুখার্জি, যা রং মেখে এসেছেন ঠোঁটে গালে। শাড়ী ব্লাউজেও রামধনু রং খেলছে।"

সতেরো মিনিট নয়, পাঁচটি মিনিট মাত্র রয়েছে সময়। চটপট ছড়া বানাতে বসে গেলুম। পুরো ছড়াটা এখন ভুলে গেছি। শেষের কয়েক লাইন মনে আছে।

রামধনু ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে
মিষ্টি হাসির সম্ভাষণ
ঠোঁটের রঙে শাড়ির রঙে
জি-সি লাহার বিজ্ঞাপন।

পরদিন তলব হল উত্তরায়ণের কোণের বাড়ি 'কোনার্কে'। অনিলদা ডেকে পাঠিয়েছেন। কী ব্যাপার? যেতেই রাণী-দি বললেন, আমাদের বন্ধু সুপ্রভা মুখার্জি তোর সঙ্গে আলাপ করতে চান।

আমি তো হাতে আশমান পাই। একজন জলজ্যান্ত ফিল্মস্টার

আমার সঙ্গে আলাপ করবেন। ঈস, কাছাকাছি বন্ধু-বান্ধব ও কেউ নেই, যাদের আমার সৌভাগ্য দেখে চোখ টাটাতে পারে। কোথায় গেল শুভময়? কোথায় গেল বিশ্বজিৎ? আমি আর একজন ফিল্মস্টার সামনা-সামনি বসে গল্প করছি—এই দৃশ্যটা ওরা একবার এদিক ঘুরে দেখে গেলেও তো পারতো।

নমস্কার করতেই সুপ্রভা মুখার্জি বললেন,—"কালকে যে ছড়াটা লিখে দিয়েছিলেন, খুব ভাল লেগেছে আমার।"

"আমি তো ভেবেছিলুম, আপনি চটে যাবেন"—

"কেন, কেন? সুপ্রভা মুখার্জির ত্বরিত জিজ্ঞাসা।

"ঐ যে, 'জি-সি-লাহার বিজ্ঞাপন', কথাটা"—

"আরে না, ঐটেই তো মজার হয়েছে। সত্যি, এখানে এই রং চং বড় বেমানান ঠেকে। কী করব বল, আমাদের মাখতে হয়। কী কর তুমি এখানে? 'তুমি'ই বলছি, কিছু মনে করলে না তো?'

আমার "না-না মোটেই না" ধ্বনি বেরোবার আগেই অনিলদা ফোড়ন কাটেন,—

"ভীষণ পাজি ছেলে, সবার নামে ছড়া কাটে। আমার নামে কী লিখেছে জানেন, "সিলেটী বাঙাল তিনি শ্রীঅনিল চন্দ।
কদাকার চেহারাটি, গায়ে বদ গন্ধ।"

এক দফা হাসির পালা। তারপর আমি বলি,—"কিন্তু অনিলদা, আপনাকে তো "সুদর্শন সুকুমার বলতে পারা যায় না। আর সিলেটী বাঙাল বলে গুরুদেবই তো আপনাকে ডাকতেন।"

"কিন্তু আমার গায়ে বদ গন্ধ তো নেই"—অনিলদার গলায় সকৌতুক আপত্তির সুর।

"তা' আমি কী করব, 'চন্দ' পদবীর সঙ্গে মিল দিয়ে বদ গন্ধ' আমাকে আনতেই হবে" নাছোড়বান্দা হয়ে আমি ও প্রশ্নের পিঠ পিঠ জবাব দিই।

অনিলদা তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন—"দেখলেন তো,

সুপ্রভা দেবী, কেমন পাজি ছেলে। ব্যস তোমাকে শাস্তি দিলাম, আজ দুপুরে তুমি এখানে খাবে।"

খাওয়ার টেবিলে বসে আবার এক দফা হাসি-তামাশার পালা। অনিলদা হৈ হৈ ফুর্তিবাজ মানুষ, খেতে খাওয়াতে ভাল বাসেন। 'মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী' রাণীদিও কম যান না। আর সুপ্রভা ও হাসি ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখতে পারেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেবীও পরিচয়ের বুনিয়াদ হল পাকা।

খাওয়া দাওয়ার পর সুপ্রভা মুখার্জি বললেন,—"বিকেল বেলা আমাকে শাস্তিনিকেতন ঘুরিয়ে দেখাবে।

ছাতিম তলার পাশ দিয়ে চৈত্যের দিকে এগোচ্ছি। শান্তি-নিকেতনের ক্লাস শেষ। বিকেলের টিফিন সেরে কেউ গিয়েছে খেলার মাঠে, কেউ যাচ্ছে খোয়াইয়ের দিকে বেড়াতে। সুপ্রভা মুখার্জি ইতিমধ্যে কখন 'মিলিদি' হয়ে গেছেন, টের পাই নি।

মিলি তাঁর ডাক নাম। এবং এই নামেই তিনি স্টুডিও মহলে, বন্ধু মহলে পরিচিতা। শান্তিনিকেতনে অনিলদা, রাণীদি ছাড়া যে দু'চার জন তাঁর পরিচিত সকলেই তাঁকে ডাকেন ঐ সম্বোধনে। তিনি শান্তিনিকেতনের একজন নিয়মিত অতিথি। প্রতি বছরই তাঁকে এখানে আসতে দেখেছি। কোন কোন বার অনিলদা রাণীদির সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন আমাদের কলেজের মুন লাইট পিকনিকে। সে দেখা দূর থেকে। দেখতাম, মৃদু হাসির সুবাস আর রঙের জৌলুস ছড়িয়ে তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সিনেমায় তাঁকে দেখেছি কতবার। স্নেহশীলা মায়ের চরিত্রে অভিনয় কে ভুলতে পারে। অভিনয় কুশলতাতেই তিনি আমার শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সিনেমার যাঁরা খবর রাখেন, যাঁরা অভিনয়ের সমঝদার, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন সুপ্রভা মুখার্জির অপূর্ব অভিনয়দক্ষতার কথা। বিশেষ করে 'ভুলি নাই' ছবিতে তাঁর অভিনয় ভুলবার নয়। জাঁ রেঁনোয়ার ইংরেজী

ভাষায় তোলা 'দি রিভার' ছবিতেও তিনি চমৎকার অভিনয় করেছেন।

শান্তিনিকেতনের এদিকে ওদিকে ঘুরছি, আর তাঁকে দেখাচ্ছি—"এই হচ্ছে বেনুকুঞ্জ"—এ বাড়িতে দিনু ঠাকুর থাকতেন। পাশেই চা-চক্র। ঘরের নাম "দিনান্তিকা"। অধ্যাপক উপাধ্যায়ের দল এখানে বিকালবেলা চায়ের আড্ডা বসান। ঐ দিকটা গুরুপল্লী, আর এই 'চীন ভবন'। তা অবশ্যি বলে দিতে হবে না। সামনের চীনে হরফ দেখেই আপনি নিশ্চয় আন্দাজ করে নিয়েছেন—"

এমনি চলছে আমাদের শান্তিনিকেতন পরিক্রমা। শালবীথি, আম্রকুঞ্জ ঘুরে তালধ্বজের পাশ দিয়ে গিয়ে পড়েছি ডাকঘরের সামনের বড় রাস্তায়, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসি,—"এবারে আপনার গল্প বলুন।"

এক গাল হেসে বললেন,—"আমার গল্প কিছুই নেই। সিনেমায় আমার অভিনয় দেখনি ?"—

"দেখিনি মানে, কত দেখেছি। দারুন ভাল লাগে আপনার অভিনয়—" আমি প্রায় চেঁচিয়ে বলি।

"সত্যি"—

"হ্যাঁ, সত্যি, বিশেষ করে মায়ের অভিনয়ে আপনার জুড়ি নেই।"

হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি—"আচ্ছা, সিনেমা আপনার ভাল লাগে ?"

"ঠিক বুঝতে পারি না। প্রথম প্রথম দারুণ ভাল লাগত, মজাও পেতাম, এখন আর সে মজা নেই। তবে নেশা ধরে গেছে। অভিনয় না করতে পারলে ভাল লাগে না। কিন্তু ভাল পার্ট হওয়া চাই। ছ্যাবলা পার্ট আমার সহ্য হয় না"

"আচ্ছা আপনি হঠাৎ সিনেমার লাইনে এলেন কী করে ?—" আমার পুনর্জিজ্ঞাসা।

"এলুম একেবারে হঠাৎ"—মিলিদি হঠাৎ যেন অতীতের দিকে

ফিরে কেমন আনমনা হয়ে যান। বলেন—"তোমরা জান না বোধহয় জীবনের প্রথম দিকে নেমেছিলুম দেশোদ্ধারের কাজে। ভেবেছিলুম, ওতেই জীবনপাত করব। তা আর হল কই।"

খানিক থেমে আমার কোন কথার অপেক্ষা না করেই বলতে থাকেন,—'আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন অসহযোগ আন্দোলোনের সময়। চাঁদপুরে। সেখানে তখন নাবিক ধর্মঘট চলছে। বিরাট সভা ডাকা হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। শুনলে অবাক হবে আমি সেই সভায় "জ্বালাময়ী" এক বক্তৃতা দিয়েছিলুম। অনেকক্ষণ। বক্তৃতার পর দেশবন্ধু আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন—"চমৎকার বক্তৃতা করতে পার তো তুমি"। এখনও আমার সেদিনের কথা মনে স্পষ্ট আছে। তারপর আরও কয়েক বছর কাটল। দেশসেবার নেশা কোথায় মিলিয়ে গেল। ঝোঁক গেল সিনেমায় নামার। অভিনয় করার বাতিক ছোট থেকেই। কিন্তু বাড়ি থেকে অনুমতি মিলল না। কিছুদিন পরে বিয়ে হয়ে গেল। সিনেমায় নামার ঝোঁক তবু গেল না। অনেক চেষ্টার পর, অনেক সাধ্য সাধনার পর অবশেষে ঢুকে পড়লুম সিনেমা লাইনে। আমার প্রথম দিকের ছবি "আলিবাবা" মধু বসুর তোলা। তারপর থেকেই এ-লাইনেই আছি। কত বইয়ে অভিনয় করেছি। সবগুলোর নামও মনে নেই।"

মিলিদি থামলেন। আমি তন্ময় হয়ে তার কথা শুনছি। হঠাৎ বলেন—"চল বাড়ি ফিরে যাই। সন্ধ্যেবেলা যাওয়ার কথা আছে এক জায়গায়।"

কোনার্ক পৌঁছে ফিরে আসার সময় বললেন—"কাল ভোরে চলে যাব, কলকাতায় গেলে দেখা কর।"

বললাম—"আপনার ঠিকানা জানি না যে।"

দাঁড়াও লিখে দিচ্ছি,—বলেই পুরানো চিঠির খাম ছিঁড়ে তার উপরে লিখে দিলেন নিজের ঠিকানা।

বললেন—"এখন থেকে আমাকে তুমি 'মিলিদি' ডাকবে না, 'মিলি মাসী' ডাকবে, আমি তোমার মায়ের বয়সী।" চিরকুটে প্রথম লিখলেন 'মিলিদি' তারপর কেটে করলেন 'মিলিমাসী'।

কথা দিয়েছিলাম, কলকাতা গেলে দেখা করব। তারপর বহুবার কলকাতায় গিয়েছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে পড়ি তাঁর মৃত্যু-সংবাদ। তিনি আর নেই। ঐ ঠিকানায় আমার কোন দিনই যাওয়া হবে না।